লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে

রামশঙ্কর চৌধুরী



ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ : শ্যামল জানা

লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে

শিল্পী ও লোকসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ

খালেদ চৌধুরীকে

গ্রন্থারম্ভের প্রাক্কালে

প্রবীণ লোকসংস্কৃতিবিদ্ শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর চৌধুরী সুদীর্ঘ সময় ধরে বাংলার কৃষ্টিকলার সন্ধান ও মূল্যায়নে ব্যাপৃত আছেন। 'লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে' তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ ; এর মধ্যেও তিনি নিজের চর্যা এবং পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সুষ্ঠুভাবেই রেখেছেন যে, সেকথা প্রীতিময় আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে। তাঁর পূর্বতন গ্রন্থ 'ভাদু ও টুসু' গবেষণার লব্ধফল হিসেবে এক সময়ে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্তমান বইটি তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিকে সুস্থিত করে তত্ত্বপ্রজ্ঞাকে সৌধ হিসেবে গড়ে তুলেছে। লোকসঙ্গীত বিষয়ে প্রয়াত বন্ধু হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুকুমার রায়, বুদ্ধদেব রায়-প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা যে-সমস্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখেছেন, সেই ধারাতেই রামশঙ্কর বাবুর বইটিও সর্বশেষ সংযোজন এবং অবশ্যই অত্যন্ত মূল্যবান্ অবদানরূপে এটি গণ্য হবে।

বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রচলিত বহুবিচিত্র লোকসঙ্গীতের মৌলিক রূপটিকে লেখার মধ্যে অন্বেষণ করেছেন রামশঙ্করবাবু। তাঁর গবেষক-মনটির পুষ্টিবিধান করেছে সমাজ-ও-রাজনীতির চেতনাসমৃদ্ধ যে-মানসটি, এই অনুসন্ধিৎসার মধ্যে তারও প্রতিফলন ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে দেশ এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকাটি সম্বন্ধে প্রগতিমুখিন একটি দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে যে সত্যিসত্যিই কোনো মানববিদ্যারই মর্মগভীরে পৌঁছনো যায় না— সেই নিগূঢ় সত্যটি এখানে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য। তাছাড়া রামশঙ্কর বাবু শুধুমাত্র লোকসংস্কৃতির গবেষক কিংবা সমাজচেতনা সম্পন্ন রাজনীতির মানুষই নন। তিনি সুকৃতী কথাশিল্পীও। তাঁর শিল্পী-প্রতিভারও যথোচিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই বইয়ের মধ্যে। এ হলো প্রতিভা এবং দক্ষতার ত্রিবেণী সঙ্গমের মতো।

বাংলার লৌকিক বর্গের সঙ্গীতের সমস্ত ধারার সম্পর্কে এই বইতে আলোচনা করা হয়নি। কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ই এর মধ্যে বিশ্লেষিত, আর তারই প্রেক্ষাপট হিসেবে লোকসংস্কৃতির মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধেও লেখক অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন। হয়ত তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই সকলে

ঐক্যমত্য পোষণ করবেন না—সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখার ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না যে, তাও এখানে বলতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, বিশ্লেষণের পরম্পরা যদি যুক্তিশুদ্ধ হয়, তাহলে একমত না হলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটিকে মেনে নেওয়া সম্ভব। রামশঙ্কর বাবুর এই বইয়ের ক্ষেত্রেও সেটাই হবে, এমনই প্রত্যাশা করি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

২১/১, রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
টালিগঞ্জ
কলকাতা-৭০০০৩৩
১৫ জুলাই, ১৯৮৮

নিবেদন

আমার 'ভাদু ও টুসু' গ্রন্থখানি ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ মহলের নিকট যে সমাদর লাভ করেছে, তাই আমাকে এই গ্রন্থটি লিখতে প্রেরণা জোগায়। এর প্রবন্ধগুলি সত্যযুগ দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় ও গণনাট্য সংঘের মুখপত্র গণনাট্য পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে হুবহু ওই লেখাই নেই। প্রবন্ধগুলিকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করবার জন্য কিছু যোগ বিয়োগ করতে হয়েছে।

ফোকলোরকে আমি প্রাচীন ঐতিহ্য বলেই যে গণনা করি তা নয়। ফোকলোর যে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হয়েও কাজ করতে সমর্থ, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রবন্ধগুলি লিখবার চেষ্টা করেছি। কতখানি সার্থক হয়েছে তার বিচারের ভার সুধী মহল করবেন।

নাগাদের সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকেই আমরা যা জানি তা সম্পূর্ণ নয়, বর্তমানে তাদের অতীত সংস্কৃতির খুব বেশি পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই কারণে নাগাদের লোকসংগীত বিষয়ে আলোচনা করেছি।

মার্কসবাদীদের নিকট ফোকলোরের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে এংগেলসের ফোকলোর চর্চা প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সাংবাদিক ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম।

কবি বন্ধু শ্যামসুন্দর দে'র প্রেরণাও এই গ্রন্থ লিখতে সাহায্য করেছে, তাঁর নিকট ঋণ স্বীকার না করে থাকা যায় না। অনুজ বন্ধু এবং লোক-সাহিত্য বিশেষজ্ঞ ড: পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর অমূল্য উপদেশ এবং কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন কবি অধ্যাপক পার্থ রাহা। তাঁদের কাছেও আমি ঋণী থাকলাম। আমার কমরেড, গণনাট্য পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শান্তিময় গুহও পান্ডুলিপির কিছু কিছু জায়গায় সংশোধনে সাহায্য

করেছেন। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কোনো পরিমাপ হয় না। সর্বশেষ, চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ-এর নিকট। অমন একটি খ্যাতনামা প্রকাশন সংস্থা যে আমার গ্রন্থ প্রকাশ করবেন, এটা ছিল দুরাশা। জীবনে এর থেকে বড়ো সম্মান আর কি হতে পারে!

আসানসোল
২৮. ৯. ৮৮.

রামশঙ্কর চৌধুরী

প্রকাশকের বক্তব্য

রামশঙ্কর চৌধুরী সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রে তাঁকে যেতে হয়েছে নানা এলাকায়, মিশতে হয়েছে বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে। ফলে তাঁর জমার থলিতে জমেছে জাতি-উপজাতির সংস্কৃতির বিভিন্ন খবরা-খবর আর অর্জন করেছেন অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার আলোতে তিনি লিখেছেন অনেকগুলি প্রবন্ধ যা একান্তভাবে লেখকেরই মত। সংস্কৃতির আঙিনায় লোকসংগীত ও লোক সংস্কৃতির বিশেষ মূল্য রয়েছে, তাই আমরা লেখকের দীর্ঘ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতায় লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করছি। প্রসঙ্গত জানাই যে মূল পান্ডুলিপিটি পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত কমরেড শান্তিময় গুহ ও ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত গভীর নিষ্ঠায় দেখেছেন ও মতামত দিয়েছেন। সেই একই পথ অনুসরণ করেছেন কবি অধ্যাপক পার্থ রাহা। তিনি শুধু পান্ডুলিপির ক্ষেত্রেই নয়, মুদ্রণের ক্ষেত্রেও প্রভূত সহযোগিতা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শান্তিময় গুহ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাই তাঁদের স্মরণ করে পল্লব সেনগুপ্ত ও পার্থ রাহাকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি বইটি লোকসংগীত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রয়োজনে লাগবে।

মার্চ ১৯৯১

লোকসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে

মানুষ তার সৃষ্টির আদি থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই শুধু নয়, সংগ্রামে প্রকৃতিকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়ে বেঁচে আছে। এই বাঁচার পথে এগিয়ে যেতে যেতেই সে করেছে নূতন নূতন সৃষ্টি। নব-সৃষ্টির মহানন্দে সে অগ্রসরমান; এই অগ্রগামিতার কোন অধ্যায়ে লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি ঘটেছিল অর্থাৎ তার উৎসটি কোন সমাজ-কন্দর থেকে আবিভূর্ত হয়েছিল তাই খুঁজে বের করাই আমাদের লক্ষ্য এবং কেনই বা সঙ্গীতের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তাও জানা দরকার, মূলত এটিই প্রধান। যদি এর প্রয়োজন না থাকত তবে তা সৃষ্টি করার চাহিদাও থাকত না।

এই বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে আবশ্যিকভাবে আমাদের মার্কস-এঙ্গেলস-এর নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক পথেই অগ্রসর হতে হবে, এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। যাই হোক গান নাচ চিত্র ইত্যাদি বা কাব্য, কাহিনী যাই কিছু বলি না কেন, সবই মানস সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক বিচারে 'মন' ও বাস্তব, তা আধ্যাত্মিক নয়।

এই মানস আবার কি উপায়ে ইতিহাসের কোন সমাজে বা পর্যায়ে সৃষ্ট হয়েছিল তাও জানা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকগণ সমাজকে বিভক্ত করেছেন তিন ভাগে, যথা—১) প্রাচীন যুগ, ২) মধ্যযুগ, (৩) আধুনিক যুগ। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস মানবসমাজকে ভাগ করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। এদের বিচারে মানুষের জীবিকা উপায়ের পদ্ধতিই সমাজকে মূলত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছে।

১) আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ

২) দাস প্রথার যুগ

৩) সামন্ততন্ত্রের যুগ

৪) পুঁজিতন্ত্রের যুগ

৫) সমাজতন্ত্রের যুগ।

যুগের এই পরিবর্তন মানুষই করেছে, দেবতা নয়, কেমন করে করেছে তা আজকার দিনে ব্যাখ্যা করার খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, তবুও সংক্ষেপে কিছু না বললেও চলে না।

মনুষ্যেতর জীব পরিবেশের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ ecology-ই প্রধান, কিন্তু মানুষ পরিবেশ বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই বাঁচতে পারে না, তাই তার নিজ প্রয়োজনে পরিবেশবিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছে অর্থ-বিজ্ঞানে।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস শিল্পের ভিত্তি রূপে শ্রমের ভূমিকাকেই স্থান দিয়েছেন।[১]

বর্বর বা বিষাদ যুগেই মানুষ তার শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাতের ব্যবহারও করতে অভ্যস্ত হয়। এবং এই হাতের ব্যবহারই আবার জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করে উন্নত উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বা আবিষ্কারের পূর্বে চৈতন্যেরও সৃষ্টি করে, কাজেই এই যদি বলা যায় শ্রম+শ্রম =হাত, শ্রম+শ্রম+শ্রমগত সহযোগিতা=ভাষা, তৎসম্বন্ধীয় বিকাশ তাহলে হয়ত ভুল বলা হবে না।

"They begin to differentiates themselves from animals as they begin to produce their means of subsistence, a step which is conditioned by their physical organisation. By producing their means of existence men indirectly produce their material life itself. (German Ideology—Marx and Engels)"[২]

যাই হোক ভাষা আদিম-সাম্যতন্ত্রী যুগেরই দান। যে যুগের সঙ্গে একটা বৃহৎ স্থান আনুমানিক লক্ষ বৎসর ব্যাপী বর্বর বা নিষাদ যুগ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। উপরিউক্ত প্রথম সমাজ স্তরে যে তিনটি বিভাগ, এবং তিনটি বিভাগের যে পরিচয় এবং যে মূল বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার ঘটেছিল তার পরিচয় এঙ্গেলস সংক্ষিপ্তকরণ করে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে;

"For the timebeing we can generalize Morgan's Periodisation as follows :

Savagery—The period in which the appropriation of natural products, ready for the use, predominated ; the things produced by man were, in the main, instruments that facilitate this appropriation. Barbarism—the period in which knowledge of cattle-breeding and agriculture was acquired, in which method increasing the productivity of nature through human activity were learnt.

Civilization—The period in which knowledge of the further working-up of natural products, of industry proper, and of art was accquired." The Origin of the Family—*Pre-Historic Stage of Culture*—Engels P. 41[৩]

বর্বর যুগের অন্যান্তরগুলি বাদ দিলে একেবারে নিচু স্তরে মাটির পাত্র

আবিষ্কৃত হয়। আগুনের আবিষ্কার পূর্বেই হয়েছিল এবং এই কারণে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনও ঘটেছিল। এখন থেকে সংগৃহীত বা শিকারলব্ধ মাংস বা মাছ আগুনে ঝলসে খাবারই রীতি ছিল। পশুকে গৃহে পালনের প্রয়োজনীয়তা এই সময়েই উপলব্ধি হয়। চাষ শুরু হয় যখন, তখন বর্বর যুগের মধ্য স্তর, এর ফলে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। খাদ্য হিসাবে দুধ ও মাংসই ছিল প্রধান।

বর্বর যুগের উচ্চস্তরে লোহা গলিয়ে অস্ত্রের ব্যবহার করা হয়। লোহার লাঙলও ব্যবহৃত হয়। মহাপন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে এই সমাজের মানুষ লিপি আবিষ্কার করেননি। তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না তাদের গীত কুশলতার কথা, বলেছেন, ছন্দ ও গীতে তেমন পারদর্শিতা ছিল না, "অথবা হইতে পারে তাহাদের গীত কুশলতার পরিচয় আমাদের কাছে পৌঁছে নাই" [৪]।

ভারতবর্ষে চাষ যখন জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন রূপে পরিগণিত হলো, তখন থেকে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পুরুষ ও নারীর শ্রম বিভাজনও যেমন হলো, তেমনি আবার উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে জাদু ক্রিয়াও শুরু হলো। গানও যে গীত না হত তা নয়, কেন না জাদু ক্রিয়া করতে গেলেও, তার সংগেই নৃত্য ও সঙ্গীত যুক্ত ছিল বলেই মনে হয়।

জাদু, কামনা পূরণের অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছু নয়। হাজার হাজার বছর অতিক্রমের পরে আজও ভারতবর্ষে এই জাদু টিঁকে আছে। টিঁকে আছে এই কারণেই যে এদেশে দীর্ঘকাল ধরে কৃষি সভ্যতাও টিঁকে আছে। উচ্চ বর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণ, উচ্চ জাতি থেকে অতি পিছিয়ে পড়া জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে জাদুর প্রভাব বহমান।

নাগাদের একটি বিশ্বাস, শস্য ভান্ডারের সামনের ঘোরাং এ প্রেমিক-প্রেমিকা রাত্রি যাপন করে তবে ভান্ডারের শস্য বৃদ্ধি হবে।

"Magical current emanating from human fertility benefits seed rice heaped in the store buskets inside the graneries".[৫]

মাথা শিকারের সংগেও মিশে আছে এই বিশ্বাস। "………for main importance of taking a head is not the glory of war, but the gain of the magical forces inherent in the skull". (Naked Nagas—Christoph Von Furer—Haimendorf. P. 118)[৬]

ঠিক এই বিশ্বাসে কিছুদিন পূর্বেও নরবলি দেওয়া হতো। পশুবলির সংগেও এই বিশ্বাস মিশে থাকা অসম্ভব নয়।

জলপাইগুড়ির এক গোষ্ঠীর মহিলাগণ অমাবস্যার রাত্রে মাঠে গিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নাচ গান করেন—এই অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃষ্টি হয়। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সব দেশেই এমনি সব জাদু টিঁকে আছে। জলপাইগুড়ি জেলার উক্ত অনুষ্ঠানের মতোই মেক্সিকোর মেয়েরাও তা করে থাকেন। এঁরা পূর্ণিমার রাত্রে চুল খুলে মাঠে গিয়ে গান করেন—বিশ্বাস মাথার চুলের গোছার মতো ফসল ফলবে।

বাঙালী মেয়েরা যে ব্রতগুলি পালন করেন, তার সঙ্গে মিশে আছে একটি বিশেষ বিষয়। সে বিষয়টি হলো কৃষি সংক্রান্ত। এঁদের বিশ্বাস এই ব্রতগুলি পালিত হলে উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে।

বৈশাখে—গোকুল ব্রত। অশ্বত্থ পট ব্রত

ভাদ্রে—তিন কুজারি ব্রত

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত, তুষ তুষালি ব্রত

মাঘে—তারণ ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত, বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুরের ব্রত ইত্যাদি।

ব্রতগুলি প্রাচীনতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই আদি অকৃত্রিম ব্রতগুলি অতি প্রাচীন—আর্যেরা এদেশে আসবার আগে থাকতেই এ দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।'

ব্রতগুলি নিশ্চয়ই কামনা পূরণের উৎসব বলাই বিধেয়। তবে একের কামনা নয়—দশের কামনা।

একথা থেকেই বোঝা যায় সমাজের আদিস্তরে সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান হলো এই ব্রতগুলি।

"একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া ব্রত বলে ধরা যায় না, যদিও ব্রতের মূলে কামনা চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া৮ ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশ্যে করছে—" বোধ হয় এই জন্যে ব্রত শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, উপাসনাও কামনা পূরণের ক্রিয়া তাই বলে উপাসনা ব্রত নয়। কেন নয়? "একটি একের মধ্যে……উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত …কামনার সফলতাই তার শেষ।"৯

অনুষ্ঠান (rites)-এর এইরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীমতী জেন্ হ্যারিসন্। ক্রিয়া যজ্ঞে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন হয় দুটি গুণের। একটি আবেগের চাপ দ্বিতীয়টি যৌথ ভাব। আদিম সমাজে এ দুটিই ছিল। এই প্রসঙ্গে ইনি বলেছেন—

"আদিম মানুষদের মধ্যে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব নেহাতই ক্ষীণ, সে হয়ত একা একা

উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে আনন্দে ভয়ে, কিন্তু পুরো গোষ্ঠী যতক্ষণ না এই ক্রিয়ায় মেতে উঠছে, ততক্ষণ তা ছন্দময় হবে না, তার মধ্যে সম্ভবত তীব্রতা থাকবে না।" (অনুবাদ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন ১৫৪ পৃঃ)[১০]

আমাদেব উদ্দেশ্য ব্রতের আলোচনা করা নয়, যেহেতু অবনীন্দ্রনাথ এগুলিকে প্রাগার্য অনুষ্ঠান বলেছেন, তাই এগুলিকে গ্রহণ করে দেখতে চাই এর সঙ্গে গানের সম্পর্ক আছে কি না। প্রাগার্য যুগের গান গাওয়া তো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রতগুলির সঙ্গে কি গান গাওয়া হয়? যদি হয় তবে ধরে তো নিতে পারি গান গেয়ে অনুষ্ঠান তখনো করা হতো। বলতে গেলে অনুষ্ঠানের থেকে গানের গুরুত্বই ছিল বেশি, তা বলবার চেষ্টা করব।

আজো যে কয়টি ব্রত বেঁচে আছে—তাদের নীরসতাকে সরস করেছে ব্রতের গানগুলিই। গান বাদ দিয়ে ব্রতানুষ্ঠান হয় না, অন্তত আমরা হতে দেখিনি। কাম্য বস্তুটিকে লাভ করবার প্রয়াসে সকলে মিলে একই সুরে একই ছন্দে আন্দোলিত হয়ে গান করবে, কামনা করবে, তন্ত্র নয় মন্ত্র নয়—গান, গান আর গান। সুরের বৈচিত্র্য তেমন নেই, অনেক সময় আবৃত্তিধর্মী মনে হলেও সুর একটা থাকে।

যেকালে এই ব্রতগুলির সৃষ্টি, সেই কালের মানুষদের অবসর বিনোদনের সময় যে ছিল, তা হয়তো নয়। হয়তো গানগুলির মধ্যে সৌন্দর্য-চেতনাও ছিল না, হয়ত ছিল আদিম পর্যায়ের। এই প্রসঙ্গেই ফিসার বলছেন:

"Art at the dawn of humanity had little to do with 'beauty' and nothing at able to do with any aesthetic desire"[১১]

আদিম যুগের এই সঙ্গীতগুলির সুরের ধারা যে একালেও এসে পৌঁছায়নি তা বলা হয়তো যাবে না। সুরের অনেকটাই হয়তো মিশে আছে নাগা, হোড়, মুণ্ডা, কোল, ভীল, খরবার, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে। ঠিক লোকসঙ্গীত আমরা যাকে বলি, তা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু লোকসঙ্গীতের আদিকাল বলা হয়তো অন্যায় হবে না।

সমাজ এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন হওয়ায় সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজের রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। তৎসঙ্গে ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। এই বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বহিরাগত মানুষদের প্রভাবও থাকে ক্রিয়াশীল।

অনেকের মতে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময় থেকেই শ্রেণী সমাজ ফুটে ওঠবার

লক্ষণ দেখা দিয়েছে। (লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৬০৫)।[১২]
শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার ভারতবর্ষের যুগগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে :

১) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ (হরপ্পা সভ্যতা ইহার এতদ্দেশীয় নিদর্শন।)

২) জন যুগের আর্য সমাজ। বৈদিক যুগের আর্যদের প্রথম দিককার সমাজ এইরূপ ছিল—পিতৃপ্রধান, পশুপালক ও কৃষি-'জন' বা ট্রাইবে নিবদ্ধ; সম্পত্তি ট্রাইবগত নয়, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ; শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে। এই 'জন যুগে'র আর্যেরা তুলনায় 'হরপ্পা' সভ্যতার মতো উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই সেই আদি সভ্যতার অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আর্য সমাজ আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে 'জন যুগের' পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে—'বৈদিক যুগ' সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই। অবশ্য কোন 'জনপদ' বা ট্রাইবল্ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত পাই।

৩) 'সামন্ত যুগ' বা ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ। এইরূপ ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের আধিক্য সামন্ততন্ত্রের মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থা বলিয়া গণনা করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামন্ততন্ত্রের সর্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য। ইহা দেখা দেয় বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই—যোদ্ধৃ শাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্শ্বে তখন হইতেই দেখি বণিক শ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্ত্যজদের। (সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃ ৭৭-৭৮)[১৩]

এত দীর্ঘ বিবরণ না দিলেও চলত, ইচ্ছে করেই দিতে হলো এই কারণে যে বৈদিক যুগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পূর্ব যুগ শেষ হয়ে যায়নি। বরং দেখতে পাই এই যুগেও পূর্বযুগের সংস্কৃতিকে অনেকাংশে আত্মীকরণ করে নেওয়া হয়েছে। এই যুগে কি সঙ্গীত ছিল? থাকলে তার রূপ কি ছিল? তার বিষয়-বস্তুই বা কি ছিল? তার মধ্যে লোকায়ত ধ্যান-ধারণার কি কিছু চিত্র পাওয়া যায়?

বৈদিক যুগকে জানার দুটি পথ। প্রথমটি বৈদিক সাহিত্য, দ্বিতীয়টি প্রত্ন-তাত্ত্বিক উপাদান। সেই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এখনো হয়তো তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা দেখে বলা যাবে, সেই কালের লোকায়ত শিল্পের অন্তর্গত সঙ্গীত ছিল কিনা। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য যদি আমরা স্বচ্ছ দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে অধ্যয়ন করি তবে নিশ্চিত দেখব লোকায়ত ধ্যান ধারণার ছড়াছড়ি বেদের এই সূক্তগুলি শুধু তো মন্ত্র নয়, গানও। সামের সূক্তগুলিতো গানই, গানগুলির ভাষা সুললিত হলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেই অন্ন প্রাপ্তির উপায়।

তস্মাদ্ হৈব বিদ্বাদ্গাতা ব্রূয়াৎ

॥ ১।৭।৮ ॥

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামগানস্যেষ্টে

য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি

॥ ১।৭।৯ ॥

(লোকায়ত : দর্শন ১৫৬ পৃ:)

অর্থাৎ...সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন। তোমার কোন কাম্য বস্তুকে গান করিব, কেননা যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন তিনি কামগানকে শাসন করেন। (তর্জমা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) হিউমের অনুসারে : "For truly he is the lord of winning of the desires by singing" দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কামগানস্য ও আগায়ানি শব্দ দুটির অর্থ খোঁজার জন্য তৎকালীন মানুষদের ধ্যানধারণাগুলিকে মনে রাখতে বলেছেন।[১৪]

সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দশটি অধ্যায় আছে। শেষ আটটি অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদ। যাঁরা ছন্দ অর্থাৎ বেদ গান করেন তাদের নাম ছন্দোগ। ছন্দোগদিগের ধর্ম ও শাস্ত্রকে ছান্দোগ্য বলা হয়। গান করবার সময় বীণা ব্যবহৃত হতো।

এই উপনিষদের ॥২।৩।১॥ ও ॥২।৩।২॥ গানে আছে :—বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে, বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু তাহা উত্থিত হয়। তাহাই হিংকার। বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাই উদ্গীথ, বিদ্যুৎ চমকায় ও গর্জন করে তাহাই প্রতিহার, বৃষ্টিপাত শেষ হয় তাহাই নিধন, যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করেন তাহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি বর্ষণ করাইতে পারেন। (লোকায়ত দর্শন [এর সঙ্গে কি জলপাইগুড়ি জেলার এক গোষ্ঠীর মেয়েদের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি তার দূরাগত যোগ আছে ?] —দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫৬ পৃ:)[১৫]

শ্রীঅতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত 'উপনিষদ' (হরফ প্রকাশনী) প্রকাশিত হয়েছে তাতে উদ্গীথের অর্থ করা হয়েছে এইরূপ : উৎ, গী-ও থ এই তিনটি অক্ষরকে নিয়েই উদ্গীথ। এঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, প্রাণই উ, কারণ প্রাণ দ্বারাই সকলের উত্থান হয় ; বাক্-ই গী ; কারণ বাক্যকেই গী বলা হয়। অন্নই 'থ' কারণ এ সমস্ত অন্নেই প্রতিষ্টিথ (পৃ: ৪২২)[১৬]

এই উপনিষদে আবার বলা হয়েছে, অন্নং নঃ ভগবান আসায়তু।[১৭] ছান্দো-

গের দ্বাদশ খণ্ডে কুকুর বিষয়ক উদ্গীথের উল্লেখ আছে। এক সময়ে দল্ভপুত্র বক অথবা গ্লাব মৈত্রেয় বেদ পাঠের জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন।

তাঁহার নিকট এক সাদা রঙের কুকুর উপস্থিত হলো। আরো কতকগুলি কুকুর তাঁহার নিকট এসে বলল 'আমরা যাহাতে খাদ্য পাই সে জন্য সামগান করুন; আমরা ক্ষুধার্ত।'

তস্মৈ শ্বা শ্বেতং প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥ ২

এই কুকুরগুলিই অন্ন পাবার জন্য বহিষ্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিবার সময়ে উদ্গাতারা যেমন পরস্পর সংলগ্ন হয়ে চলতে থাকে, সেই কুকুরেরাও সেই রকম করতে লাগল। তারপর বসে 'হিং' এই শব্দ উচ্চারণ করল;

তে হ যথৈ বেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমানাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্ আসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥৪[১৮]

কুকুর বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে সত্যই কি তারা কুকুর? কুকুর ক্ষিদে লাগার কথাও বলতে পারে না। এই কুকুরগুলি মনে হয় যে ক্ষুধার্ত মানুষ, নিঃস্ব মানুষ।

যাই হোক অন্ন প্রাপ্তির জন্য নাচ এইটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গানের উল্লেখ না থাকলেও অনুমিত হয় গান সহযোগেই নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল।

সেই অতীত যুগে নাচ গান এবং কবিতা একই উদ্দেশ্যেই রচিত এবং গীত হতো।

অথর্ববেদে তো বর্ণিত আছে বিয়ের সময় মেয়েরা গান গাইতেন।

ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' (অনুষ্টুপ প্রকাশনী হতে প্রকাশিত) গ্রন্থে চার্বাক বা লোকায়তিকদের বেশ কয়েকটি লোকগাথার উল্লেখ করেছেন। এর দুই চারটি তুলে দেওয়া অসমীচীন হয়তো হবে না।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥

স্বর্গ বলে কিছু নেই। অপবর্গ বা মুক্তি বলেও কিছু নেই। পরলোকগামী আত্মা বলে কিছু নেই। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিস্ফল।

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংসতে ॥

"জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান

কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না ? (অর্থাৎ স্বর্গে যাবার অমন সোজা সড়ক থাকতেও যজমান কেন নিজের পিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে ?)"

স্বর্গাস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥

"যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে দান নেহাতই বৃথা, কেন না যিনি প্রাসাদের উপর উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি হবার কথা নয়।"

এমনি আরো আছে। লোক গাথা বলেই নমুনাগুলি দিয়ে দেখাতে চাই, তখনকার দিনেও এর অস্তিত্ব ছিল।[১৯]

এর পরে আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করব মহাভারতের মতো মহাকাব্যে সংগীতের উল্লেখ পাওয়া যায় কি না, যদি পাওয়া যায় তবে এই সংগীত কারাই বা গাইতেন। মহাভারতের সময়ে সমাজে শ্রেণী বিভাজন হয়ে গেছে। বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। পুরোহিত এসেছে। একই মানুষ সব কিছু করছে না। কারু শিল্পী, আয়ুধজীবী মানুষও রয়েছে।

"মহাভারত হয়ত স্থানীয় একটি সংঘর্ষের বিবরণ মাত্র ছিল। কিন্তু এ কাহিনী চারণ কবিদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে।"[২০] চারণ কবিরা হয়ত সুর সহযোগে গানের মতো করেই গাইতেন।

মহাভারতের সময়ে, আমরা পরে দেখবো নাচ গান তো ছিলই এমন কি বাদ্য যন্ত্রও ব্যবহৃত হতো। যন্ত্রের মধ্যে যেগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হলো—ঢোল বাঁশী ও বীণা। বীণার আকার বা গড়ন এখনকার মতো অবশ্যই ছিল না। আকার ছিল নাশপাতির মতো। আরো পরে এসেছে করতাল ও তারের বাজনা।[২১]

সামগানের শব্দ সুর ও মাত্রার নির্দেশ পাওয়া যায়। আর্যদের সপ্ত সুরের জ্ঞান ছিল।[২২]

গানের ক্ষেত্রে বর্ণগত বিভক্তিকরণও ঘটেছিল। নিম্নবর্ণের মানুষেরা বেদের গান গাইবার অধিকারী ছিলেন না। উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষকে যেমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন, তেমনি তাদের গীত গানকেও নিন্দা করতেন।

কয়েকটি উদাহরণ মহাভারত থেকে উদ্ধার করে নিম্নে বর্ণিত হলো :—

১। "সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, হে রাজন ! মহামতি অশ্বত্থামা এই প্রকার স্তব করিলে এক হিরন্ময়ী বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান হুতাশন স্বয়ং তেজঃ প্রভাবে দিঙমণ্ডল ও গগণমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদী মধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্রাঙ্গদধারী উদ্যত বাহু

অসংখ্য হস্তপদ বিশিষ্ট বহু মস্তক মুণ্ডিত উজ্জ্বল বদন উজ্জ্বল লোচন পর্বতাকার মহাগণ সকল সেই বেদী স্থানে উপনীত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর বরাহ উষ্ট্রের ন্যায়। মুখ-তুরঙ্গ, জম্বুক উল্লুক বিড়াল ব্যাঘ্র দ্বিপি, কাক, ইত্যাদি……এই সময় তাহারা হৃষ্টান্তকরণে ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ ঝর্ঝর আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ গান কেহ নৃত্য করিতে লাগিল।[২৩]

যে মানুষগুলি গান গাইল ও নাচ করিল তাদের অদ্ভুত আকৃতি এবং মুখাকৃতির পরিচয়, ছান্দোগ্যের কুকুরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনও হওয়া অসম্ভব নয়, হয়ত সেই কালেও মুখোশের প্রচলন ছিল। এখনো এই ভারতবর্ষেই নাচে বহু প্রকার মুখোসের ব্যবহার হয়। এমনো হতে পারে, যে নিজেদের গন্ডীর বাইরের লোকদের এইরূপেই চিত্রিত করা হতো। তা যাই হোক বাদ্য সহযোগে যে গান গাওয়া হয়েছিল বা নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তা মার্গ ছিল না।

২। "কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ। আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তুমি অবগত হইয়া তাহা শ্রবণ কর।

* * * *

ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভূত ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করতঃ বলিতে থাকিলেন, হে রাজন! যাহারা হিমালয় গঙ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং সিন্ধু নদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত সেই সমস্ত ধর্ম বিবর্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য, আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধবশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ী সুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব অনুপ ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত ও বিবস্ত্র ও মাল্য চন্দন রহিত হইয়া নগরের প্রাচীর সমীপে নৃত্য ও গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চিৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে।[২৪]

পানিনি এই বাহীকদের আয়ুধজীবী বলেছেন।

এই সঙ্গীতগুলিকে কি নামে আখ্যাত করা যায়, জানি না। তবে এটা সকলেরই জানা আছে যে তৎকালে 'দেশী সঙ্গীত' বলে এক প্রকার সঙ্গীত ছিল এবং যা তৎকালীন ভারতবর্ষে 'ইতর' জনরা গাইতেন। এই সঙ্গীতগুলি ভিন্ন

ভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই গানগুলিকে ভিত্তি করেই মার্গ সংগীতের সৃষ্টি হয়। এ কাজ ভরতই করেন। এবং কোন্ সংগীতকে মার্গ আর কোন্ সংগীতকে 'দেশী' বলা হবে, তার নির্দেশও দিয়ে যান।

সংগীত পারিজাতে উল্লেখিত আছে :—

মার্গ-দেশীবিভেদেন দ্বেধা সংগীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গাখ্যসংগীতং ভরতায়াব্রবীৎ, স্বয়ং ॥
ব্রহ্মণেইহধীত্য ভরতং ভরতং সংগীতং মার্গসঞ্জিতম্।
অপ্সরাভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্।
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সংগীতং দেশ ভেদতঃ ॥

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা—"স্বয়ং ব্রহ্মা ভরতকে যে সংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাহাই মার্গ সংগীত, আর অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ যে গান মহাদেবের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন দেশভেদে তাহাই দেশীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

কিন্তু আচার্য মতঙ্গ স্বপ্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"আলাপাদিনিবদ্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আলাপাদি বিহীনস্ত স চ দেশী প্রকীর্ত্তিতঃ।"[১৫]

(পদাবলী পরিচয়)

লোকসংগীতে আলাপের কোনো সুযোগ নেই বা করা হয় না। তাহলে যদি দেশী সংগীতকেই বর্তমানে লোকসংগীতের পিতৃত্বের আসনে বসানো যায়, তাহলে আশা করি বিদগ্ধ পন্ডিতগণ তাহা অন্যায় মনে করবেন না। পরবর্তী কালে অবশ্য অনেক দেশী সংগীতও ক্লাসিক্যাল সংগীতে স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশেও এই দেশী সংগীত প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের নাম সম্বলিত হয়ে সংগীতের পরিচয় পাওয়া যায়।

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলছেন—"আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, ঝুমুর গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও বিশুদ্ধ মার্গ সংগীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাই, সেই সব গানে যে কৌম বাঙালীর লোকায়ত সংগীতের ধারাই বহমান একথা কোন তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাঁওতাল কোল হো মুন্ডা শবর গারো খাসিয়া কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যেসব সুর ও তাল ও নাচের ভঙ্গি প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম।"

(বাঙালীর ইতিহাস, ২য় খন্ড)[১৬]

দীর্ঘ আলোচনান্তে এইটুকুই বলতে ইচ্ছা করি যে একদিন সেই আদিম

মানুষদের জীবনধারণের প্রয়োজনে যেমন দৈহিক শ্রমই ছিল একমাত্র সম্বল, আবার শ্রম থেকেই এবং শ্রমের জন্যেই করেছিল ভাষার সৃষ্টি, সুরের সৃষ্টি, গীতের সৃষ্টি।

কার্ল মার্কস শৈল্পিক সৃষ্টি ও নান্দনিক উপলব্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন :

Production not only provides the material to satisfy a need, but it also provides the material. When consumption emerges from its original primitive crudeness and immediacy—and its remaining in that state would be due to the fact that production was still primitively crude—then it is itself as a desire brought about by the object. The need fell for the object is induced by the perception of the object. An object d'art creates a public that has artistic taste and is able to enjoy beauty—and the same can be said of any other product. Production accordingly produces not only an object for the subject but also a subject for the object. (A Contribution to the Critique of Political Economy, Moscow, 1970. P. 197)[২৭]

গ্রন্থপঞ্জী

১ক। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ—গোপাল হালদার

১। Dialectics of Nature—Engels

২। German Ideoloy—Marx & Engels

৩। The Origin of Family—Engels

৪। মানব সমাজ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৫। Naked Nagas—Christoph Von Furer Haimendorf

৬। ঐ

৭। বাঙালীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

৮। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। ঐ

১০। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১১। The Necessity of Art—A Marxist Approach—Pelican 1970—Ernest Fischer

১২। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৩। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ—গোপাল হালদার

১৪। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৫। ঐ

১৬। উপনিষদ—অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত—হরফ প্রকাশনী

১৭। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৮। উপনিষদ—অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ চন্দ্র ঘোষ

১৯। ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২০। ভারতবর্ষের ইতিহাস—রোমিলা থাপার

২১। ঐ

২২। ঐ

২৩। মহাভারত (সৌপ্তিক পর্ব)—প্রতাপ চন্দ্র রায়। প্রকাশিত ১২৮৬

২৪। ” —রাজশেখর বসু

২৫। পদাবলী পরিচয়—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

২৬। বাঙালীর ইতিহাস (২য় খন্ড)—ড. নীহাররঞ্জন রায়

২৭। A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow 1970. P. 197—Karl Marx.

বাউল কি লোক সঙ্গীত ?

বেতারযন্ত্র, দূরদর্শন মারফত এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, লোক-উৎসবে বাউল সঙ্গীতকে লোক-সঙ্গীত অভিধায় প্রচার করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সত্যিই কি বাউল-সঙ্গীত লোক-সঙ্গীত? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, অতি সতর্কতা অবলম্বন করে আমাদের বিচারে অগ্রসর হতে হবে।

লোক-সঙ্গীতের সৃজনভূমি পল্লী। বাউল-সঙ্গীতও পল্লীতেই সৃষ্টি। শহর থেকে দূরে গ্রামের মাটিতে জন্ম হলেও, গ্রামের পরিবেশ প্রতিবেশেরই সৃষ্ট এবং বর্ধিত হলেও- বাউল না লোক, না তার রচিত এবং গীত সঙ্গীত। পল্লীতে যা গীত হয়, তা পল্লী-সঙ্গীত হতে পারে, কিন্তু সব পল্লী সঙ্গীতই লোক-সঙ্গীত নয়। এদের মধ্যে যেমন শাক্ত গান, মুর্শীদ্যা, নাথতত্ত্ব, মারফতী, দেহতত্ত্ব, সহজিয়া ও বাউল।[১] লোকসাহিত্যের গবেষকগণ এগুলিকে ধর্মীয় সঙ্গীত রূপেই বিচার করে থাকেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন গবেষকগণ কি বলেন, তাঁরা মানতে রাজি হবেন কেন। গবেষকগণের বিচার এবং অভিমত তাঁরা নাও মানতে পারেন। মানা না মানা তাঁদের অভিরুচি।

এই আলোচ্য সঙ্গীতকে ধর্মীয় সঙ্গীত বলা হলো কেন তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমাজ প্রগতির একটি বিশেষ অধ্যায়ে ধর্মের সৃষ্টি হয় এবং ধর্ম প্রচারের বাহন হিসাবে ও ধর্ম সাধনার একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ পথ হিসাবে ধর্মীয় সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে। আদিম সাম্যবাদী সমাজে সঙ্গীত ছিল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখনও লোক-সঙ্গীতের যে গানগুলি ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে, আমাদের কালে এসে পৌঁছেছে সেগুলির সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমই ছিল সঙ্গীত সৃষ্টির মূল প্রেরণা। শ্রমের জন্য যৌথ সঙ্গীত একটি আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। যে আবেগ সমষ্টিগতভাবে বিশেষ বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পালনে ছিল সক্রিয়। এইটিই সঙ্গীতের ধনাত্মক চরিত্র। আদিম সমাজের এই ধারা এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি লোক-সঙ্গীতে।

শিল্প বিচারেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে। তলস্তয়

বলেছেন, "ব্যক্তি ও মানবতার জীবন ও মঙ্গলময় প্রগতির উপায় হিসাবে শিল্পের প্রয়োজন অপরিহার্য" (What is art) লোক-সঙ্গীত অতীতে শিল্পের এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করেছে এবং এখনও যে করছে না তা নয়।

লোকসঙ্গীত লোক সমাজেরই সৃষ্ট শিল্প। কোনো ব্যক্তি-বিশেষ লোকসঙ্গীত রচনা করলেও, সেই সঙ্গীতকে সামাজিক প্রয়োজনবোধে লোক সমাজ খানিকটা পরিবর্তন পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন করে থাকে। এটি লোক-সঙ্গীতের একটি শর্ত। লোক-সমাজ বলতে আমরা তাঁদেরই বলতে চেয়েছি, যাঁদের বাঁধন মাটির সঙ্গে মিশে আছে। নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) বলেছেন:

"Folk Societies are attached to their soil emotionally by tie of habit and economically by experience."

ক্রোবারের উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী বাউল লোক সমাজের বাইরের এবং তার সংগীতও লোক সঙ্গীত হতে পারেনা।

সমাজে শ্রেণী বিভাগ হওয়ার পর সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিভক্তিকরণ ঘটে গেল। ধর্মের দিক থেকে, ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে কৌম সমাজের অনেক-গুলিই পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় ধর্ম ও দেব-দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যান। এখানে একটিই উদাহরণ দিচ্ছি; উর্বরতার প্রতীক রূপে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বৃক্ষ ও লিঙ্গ পূজা করতেন। বৃক্ষ ছিল সজীবতার প্রতীক আর,—লিঙ্গ পূজা সম্পর্কিত ছিল ফসল উৎপাদনের সঙ্গে পরের যুগে "বৃক্ষ পূজা বন দুর্গা বা শক্তি পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন "শৈব ও শক্তি ধর্মের উৎপত্তি সিন্ধুজনের আদিম ধর্ম থেকেই। তৃতীয় শাখাটি মিশ্র বা শংকর জাতি কৃষ্ণ গোত্রের কৌম দেবতা থেকে জন্মলাভ করেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এই সব অনার্য ধর্মমতকে যজ্ঞের অগ্নিতে শুদ্ধ করে বিশুদ্ধ করে নেন।" (মনোরঞ্জন রায়: ইতিহাসের দর্শন, ৬৯ পৃঃ)[২]

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জমির সঙ্গে যাদের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক ছিল নিবিড় অর্থাৎ যারা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গেই ছিল যুক্ত, তাদের অধিকার থাকল শুধু কাজ করার, ফল লাভ করার অধিকার অন্যের। মা ফলেষু কদাচন। এতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটল, উৎপাদনের সঙ্গে যে শ্রেণীর সম্পর্ক নেই, সেই শ্রেণী মনোনিবেশ করল জ্ঞান চর্চায়, এবং শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ক্রমেই বাস্তব থেকে দূরে গেল চলে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সঙ্গীত ব্রহ্মার সৃষ্ট সম্পদ রূপে বর্ণিত হলো। ঠিক বিপরীত ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল বাস্তব ক্ষেত্রে যারা ছিল সৃষ্টিশীল তাদের সঙ্গীতে। (দ্রষ্টব্য: লোকসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে)

'বাউল' সঙ্গীত আলোচনার পূর্বে আবশ্যিকভাবে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

পুরোহিত শ্রেণী বিভিন্ন গ্রন্থে এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করলেন, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। পুরোহিত শ্রেণী রাজাদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ-মহিমা রাজার বিষয়-বৈভব, ক্ষমতা ইত্যাদিকেই দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের (যিনি ছিলেন পুরন্দর) স্বর্গ রাজ্যের বিলাস বৈভবের কল্পনার জন্ম দিয়েছে। রাজার দরবারের নর্তকী ইন্দ্রের সভায় গিয়ে হয়েছে উর্বশী। (দ্রষ্টব্য—ভারতীয় দর্শন—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত)। শোষিত মানুষকে শিখিয়েছে রাজা দেবতার প্রতীক, শিখিয়েছে তাকে মান্য করতে। রাজাই দেবতা। অমরত্ব লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বেদেই প্রথম দৃষ্ট হয়। উপনিষদে সংযোজিত হলো পুনর্জন্মবাদ। এই পুনর্জন্মবাদ আসলে কিন্তু কৌম সমাজেই দেখতে পাওয়া যায়। মৃত মানুষকে কবরস্থ করে তারই সঙ্গে যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী পরিধেয় দেওয়া হতো। ফসল ফলাবার প্রাক্কালে বীজকে মাটির তলে প্রোথিত করে দিলে দেখা যেত ফসল হয়েছে। যাই হোক, এই পুনর্জন্মই অশেষ দুঃখের কারণ, তা হতে মুক্ত হতে গেলে চাই আত্মার মুক্তি। আত্মা আর ব্রহ্ম এই নিয়েই উপনিষদ। ব্রহ্মাকে জানাই হলো প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ব্রহ্মার স্বরূপ কি? মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও, কোনো দার্শনিকই, [হয়ত বৃহস্পতি (চার্বাক) এবং বুদ্ধদেব ব্যতীত] বলেননি এই পৃথিবীতেই পৃথিবীর মানুষদের দুঃখ দৈন্য ও যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। ভারতীয় দর্শন কই বলতে পারলো।

Be sure of this, I would not change my State of evil fortune for your servitude. Better to be the servant of this rock than to be faithful boy to Father Zeus.

(Aeschylus-Prometheus Bound)

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলানো হলো "সর্বধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। আমিই তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দিব।

বৌদ্ধ দার্শনিকরা বললেন, নির্বাণই শ্রেষ্ঠ। নির্বাণ কি? চৈতন্যময় আত্মার লোকোত্তর জীবনই নির্বাণ।[৩]

ভারতবর্ষে প্রধানত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও দর্শনের উৎস হিসাবে পণ্ডিতগণ দুটি ধারার উল্লেখ করে থাকেন, তার একটি ঔপনিষদিক অপরটি ভাগবতীয়। বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। ধর্মে জ্ঞান সংঘে

কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি। এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণ আদর্শ।"

বৌদ্ধ দর্শনের যুক্তি ব্রাহ্মণ শাসিত ও প্রভাবিত সমাজকে প্রচন্ড আঘাত করেছিল।

"Buddhist philosophy arose in the course of ideological struggle against the existing Upanishadic philosophy, which by that time became completely rigid and metaphysical. The Upanishads tried to discover some unchanging eternal reality behind all the changing and temporary phenomena of the world. This quest for the absolute led them to the concept of soul and the concept of Parambrahmma, the creator." (Buddhism, The Marxist Approach, People's Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi 55, Article Written by Y. Balarammoorty. P-37)

আমরা পরে দেখব বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বাউলদের মিল এবং গরমিল কোথায়।

রাহুল সাংস্কৃত্যায়নও উক্ত গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধে (Buddhist Dialectics)-এ বলেছেন, "In Buddhism there is no place of either for god (creator of the universe) or for a revealed book." (গ্রন্থ Budhism. P 1)

যুক্তি নির্ভর বৌদ্ধ দর্শন ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের অস্তিত্বের শিকড় ধরেই টান দিয়েছিল। এমনি সময়েই জৈমিনির আবির্ভাব। জৈমিনির মীমাংসা সূত্র বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব থেকে বৈদিক চিন্তা ও চর্চাকে রক্ষা করে, তার কারণ ঠিক এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের দুর্বলতার লক্ষণগুলি দেখা দেয়। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে দুটি মতবাদ দেখা দেয়। "বিভিন্ন রকম মানুষের ধর্মান্তর গ্রহণের পরে বৌদ্ধ ধর্মের উপরও নূতন চিন্তার প্রভাব পড়ল, ফলে প্রাচীন মতবাদের নূতন করে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হলো, দেখা দিল মতভেদ শেষে বৌদ্ধ ধর্মে দুটি ভাগ। তাদের একটি মহাযান অপরটি হীনযান। কণিষ্কর সময় (৭৮ খৃস্টাব্দের) কাশ্মীরে যে চতুর্থ সম্মেলন হয়, সেইখানেই এই স্থায়ীকরণ হয়ে যায়। অশ্বঘোষ তাঁর তথাতথা সূত্রে শাশ্বত আত্মা (যে আত্মা মৃত্যু রহিত) এই ধারণা প্রচার করেন। তিনি বলেন, আত্মার আকৃতি আছে। একটি হলো তথাতথা অন্যটি সংসার। 'সংসার' আকৃতি আত্মাই পুনর্জন্ম লাভ করে বাড়ে এবং মরে। অশ্বঘোষই বুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়টি পরিত্যাগ করেন। তথাতথা-র বেলায় এ হয় না। অশ্বঘোষই তাঁর সংসারসূত্রে ঐতিহ্যবাহী ঔপনিষদিক দর্শনের ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরেন। মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধের পূজায়, চৈত্যের প্রতিষ্ঠায় এবং স্তূপ

নির্মাণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধের মতবাদকে দৃঢ় ধর্ম রূপেই পালন করেন এবং রক্ষা করেন। তারপরেও আবার অনেক পরিবর্তন হয়।[৫]

এদিকে ব্রহ্মবাদী দার্শনিকরাও নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। মীমাংসা দর্শনের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। দর্শনটি ছিল কর্মপ্রধান। এই কর্মপ্রধান দর্শনের প্রভাবে উপনিষদিক জ্ঞানকান্ড গৌণ হয়ে যায়। বৌদ্ধদের বেদ বিরোধিতা ও মীমাংসকদের উপনিষদিক জ্ঞানকান্ডের গৌণতা প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিল শঙ্করের জ্ঞানকান্ড প্রধান অদ্বৈত বেদান্ত-মায়াবাদ।

বৌদ্ধ ধর্মে এবং দর্শনে নানা দার্শনিকের পরিচয় মেলে; যথা নাগার্জুন (খৃঃ ১৮০) শূন্যতাবাদের প্রবর্তক। এঁর তত্ত্বের নাম মাধ্যমিকবাদ। এর পরে আসেন অসঙ্গ ও বসুবন্ধু (খৃঃ ৪২০-৫০০) এবং দিঙনাক (খৃঃ ৫০০)। এঁরা যে মতবাদ প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ এবং যোগাচার। এঁদের মতবাদের সঙ্গে শঙ্করের ভাববাদী মতবাদের মিল আছে।[৬]

যাই হোক সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়নি। মীমাংসকদের ব্রাহ্মণ প্রধান কান্ডের অতি আচারের প্রতি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের জ্ঞান প্রধান নির্বিশেষ ও বিমূর্ত চিন্তাধারা কোন দিকে আকৃষ্ট হয়নি, এই কারণেই হয়ত রামানুজ ভক্তিবাদ প্রচার করেন। রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ গড়ে উঠেছিল ঋক্ বেদের পুরুষসূক্ত নির্ভর বৈষ্ণববাদ। পুরাণ, ভাগবত গীতাতত্ত্ব দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব সাধক কবি আলবারদের গাথা, আচার্য ভাস্কর যাদব ও যমুনার দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির উৎস থেকে। এ সবের মধ্যে রামানুজ তাঁর দর্শনের অনুকূল বক্তব্য আবিস্কার করেছিলেন।[৭]

বাউল সহজিয়াদের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো যোগ আছে কিনা, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই আলোচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য সবাই কিন্তু ঐকামত পোষণ করেন না।

ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত বলতে কি বোঝানো হবে, এই বিষয়ে দার্শনিক সাহিত্যে সংরক্ষিত যে সব সাক্ষ্য বিদ্যমান সেই সাক্ষ্য অনুসরণে লোকায়ত মতের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লোকায়ত সম্পর্কে যে সাক্ষ্য আছে তা বিচার করে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "সেই সাক্ষ্য অনুসারে, লোকায়ত বলতে পরবর্তীকালের অর্থে কোনো বিশুদ্ধ দার্শনিক মত বোঝা যায় না। পক্ষান্তরে নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত কোন এক প্রকার সাধন পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেয়—পরবর্তী কালে আমরা মূলত সেই সাধন পদ্ধতিকে আউল-বাউল কাপালিক তান্ত্রিক নামে উল্লেখ করতে

অভ্যস্ত—যদিও বলাই বাহুল্য, পরবর্তীকালে প্রচলিত এই নামের সাধন পদ্ধতিগুলির মধ্যে সুপ্রাচীনকালের সাধন পদ্ধতিটির স্বরূপ সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়।"[৮]

বহু অতীতে অর্থাৎ উৎপাদকের আদি পর্বে উর্বরা শক্তির বৃদ্ধি কল্পে যোনি পূজা করত, লোকায়ত সাধন পদ্ধতির সঙ্গে অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার সংগে দেহতত্ত্ব ও কায়া সাধনার গুরুত্ব আছে। তন্ত্রমত বলে, দেহ ভান্ডে ক্ষয় আছে, তাই আছে ব্রহ্মান্ডে। এই পর্যায়ে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থান নেই।[৯]

পন্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আউল-বাউল সহজিয়াকে তন্ত্র সাধনারই অংগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[১০] এই তন্ত্রের উৎপত্তি বৌদ্ধদের কাছ থেকেই। অবশ্য পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের, নেড়া-নড়ী বৈরাগীদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর ছিল না।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন :

"প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন বাঙলার বাউলরা নাথ-ধর্মী বা অবধূতমার্গী সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান কল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাঙলা দেশে নাথ ধর্ম বিলুপ্ত, অবধূতবাদও তাই; আর বৈষ্ণব ধর্ম ও চিন্তার প্রবাহে পড়িয়া সহজিয়াদের ধ্যান কল্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়া; কিন্তু বাউলরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই; শক্তি প্রকৃতি পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ ধারা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোন অর্থই বহন করে না। অথচ বজ্রযানী সহজযানীদের নাড়ী শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত সহজ সুখ ও মহাসুখ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্য।"[১১]

কেউ কেউ মনে করেন বাংলা দেশে তুর্কীদের আসার পূর্বে সুফী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। এঁরা প্রথমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে গুজরাট দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশে। ভারতবর্ষে সুফী মতবাদ লোকপ্রিয় ছিল অতীন্দ্রিয়বাদ এঁদের প্রথম দিকের দর্শন এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সুফীরা ভক্তিবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। বাউলদের সঙ্গে এদের একটা আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠে বা এমনও হতে পারে, সুফীদের প্রভাবেই বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।[১২]

চৈতন্যের তিরোধানের পর অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি বৈষ্ণব শাখা। 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'গৌরাঙ্গ' পূজার সম্প্রদায় গড়ে ওঠে গদাধরের নেতৃত্বে। নিত্যানন্দের নেতৃত্বেও এর একটি শাখা দেখা দেয়—এই

শাখায় ষোল শত নেড়ানেড়ীও ছিল। "এরা ছিল বিলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধ (সহজিয়া) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মানুষ"[১৩] (দ্রষ্টব্য ড: বিমানবিহারী মজুমদারের চৈতন্য-চরিতের উপাদান)। গোপাল হালদার বলছেন, এর থেকেই বোঝা যায় সহজিয়া-তান্ত্রিক মন্ডলীগুলির পক্ষে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দ্বার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল। (বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা পৃ: ৭২,৭৩) "শ্রীখন্ডের বৈষ্ণব মতবাদেও সহজিয়া প্রভাব দেখা যায় আর, নিত্যানন্দের নামে তো সহজিয়ারাই বৈষ্ণবদের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় (বৈরাগী) হয়ে ওঠেন। 'প্রকৃতি-সাধনা' 'পরকীয়াতত্ত্ব' প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের মতবাদের মধ্যে তাই সহজেই অংগীকৃত হয়" (ঐ-পৃ: ৭৩)।

অধ্যাপক গোপাল হালদারের বক্তব্য দিয়েই এই অংশ শেষ করবো: শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের যে অংশে 'অধ্যাত্ম গীতের' আলোচনা করেছেন, সেই বিভাগেই বলেছেন "অবশ্য সংগীতের আর একটি ধারাও সমানেই বয়ে চলেছিল। তাকে বলা চলে অধ্যাত্ম-ধারা। চর্যাপদ থেকে তা বরাবর বয়ে আসছিল, বৈষ্ণব পদাবলীও তারই একটা স্রোত। এ ধারাকে বলতে পারি—সাধক গীতি ধারা। বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদ আসলে সেই সাধক গোষ্ঠীর একটা প্রকাশ। সম্প্রদায়গত রচনায় এ ধারা সীমাবদ্ধ থাকেনি। সুফী সাধকেরা তাতে প্রেমের নূতন আগ্নেয় প্রবাহ সঞ্চার করেন। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই প্রভৃতি নানা সাধক গোষ্ঠী এই ধারায় নিজেদের অধ্যাত্ম অবদান যুগিয়ে যান" (পৃ: ২৩৯)[১৪]

এটি অনস্বীকার্য যে বাউলদের একটি দর্শন আছে যার বিষয় পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু আরো কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

দর্শন বলতে আমরা দুইটি দর্শনের পরিচয় জানি। একটি ভাববাদী দর্শন, অপরটি বস্তুবাদী দর্শন। আমরা আরো পরীক্ষা করে দেখতে চাই বাউল সম্প্রদায় কোন দর্শনকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে। এটি বিচার করতে হবে, তাদের সংগীতগুলিকে অবলম্বণ করেই। এ থেকেই বুঝতে পারবো লোক-সংগীতের সংগে বাউল সংগীতের পার্থক্য কোনখানে।

ভাববাদী দর্শনের অনেক আলোচনা পূর্বেই করেছি। ভাববাদী দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা বা ঈশ্বরই সর্বনিয়ন্তা। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু চলে ইত্যাদি।

এদেশে আরো বেশ কয়েকটি দেশে ধর্ম দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদী দর্শন যা সত্য নয়, তাকেই মহাসত্য বলে প্রচার করে।

"Philosophy asks what is tiue, not what is held to be true. It asks what is true for all mankind, not what is true for some

people." (Marx—The leading article in No 179 of the Kolmische Zeiting.)[১৫]

বাউল গান কোন্ দর্শনকে গ্রহণ করে রচিত হয়েছে তার পরিচয় কিছু দিয়েছি। বাউল গানে নূতন কথা কিছু কি বলেছে? বলেনি। বলেনি যে তা আমরা একটু পরেই দেখব।

বাউল-ধর্ম উদ্ভবের কালে সেই প্রাচীন দর্শনেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিনিময় প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল. যদিও কখনো কোথাও কোথাও সমবায় সংঘ গঠিত হয়েছিল, কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এক এক সময় এক এক শাসক তাঁর শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই কিছু কিছু হের-ফের করেছেন সত্য, মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এই ভূমি ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকার জন্যই দর্শনের ক্ষেত্রে কোন নবতর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁর পূর্বগামী দার্শনিকের মতগুলিকেই আপনার মত করে প্রচার করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন।

"নূতন ব্যাখ্যাকারেরাও পূর্বগামী আচার্যদের ব্যাখ্যায় নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন এবং কখনোই তার বিরোধিতা করেননি।"[১৬]

আমাদের দর্শন প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সেই প্রাচীন এমন কি আদিম পর্যায়ের ধ্যান-ধারণাগুলিকে আঁকড়ে থেকেছে দেখা যায়। "সেই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও পৌরাণিক কল্পনা এমন কি সাধন পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি থেকে অসম্পূর্ণ মুক্তি এই হলো ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য।"[১৭]

এবারে গানগুলির দিকে তাকাই।

> একটি বাউল গানের কিয়দংশ এই রূপ:
> খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
> ধরতে পারলে মনো বেড়ী দিতাম তাহার পায়।

গানটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কবি ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে, এই অংশটির উল্লেখ করে যে-কথা বলেছিলেন তা এইরূপ:

The people roam about singing their songs, one of which I heard Years ago from my road side window, the first two lines remaining inscribed in my memory.

> Nobody can tell whence the bird unknown
> Comes into the cage and goes out

I would feign put round the feet the fetter of
my mind
Could I but capture it.

This village poet evidently agrees with our sage of Upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the Unknown Being ; and yet this poet like the ancient sage does not give up adventure of the infinite, thus implying that there is a way to its realisation.[১৮]

এরপর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতায় বাউল গানের অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন

It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple, or Scriptures, in images and symbols.[১৯]

আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না, তবু আমি প্রবন্ধে পুনর্জন্ম, আত্মা ইত্যাদির উল্লেখ করেছি, এখন দেখা উচিত এই সব বাউলরা কি রূপে দেখেন। এখানেও গানকেই গ্রহণ করতে হবে।

পুনর্জন্ম দিয়েই শুরু করা যাক। বাউলরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। একটি গানে পাই :

"মন আমার আজ পড়লি ফেরে
দিন দিন পৈতৃক ধন নিলো চোরে
মায়া মদ খেয়ে মনা· দিবা নিশি ঝোঁক ছুটে না।
পাঁচ বাড়ীর উল হল না, কে কি করে।
ঘরের চোরে ঘর মারে মন, যায় না ঘুম জানবি কখন
একবার দিলে নয়ন আপন ঘরে।
বেপার করতে এসেছিলি আসলে বিনাশ হলি
লালন হুজুরে গেলি বলবি কিবে।"

গানটিতে পৈতৃক ধনের কথা বলা হয়েছে, আবার শেষের দু লাইনে যা বক্তব্য ফুটে উঠেছে, তাতে জন্মান্তরবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আরো একটি গানে আছে—

গুরু আমার পূর্বের কথা মনে নাই
জানতে এলেম তাই।

এখানে 'পূর্বের কথা' বলতে পূর্বজন্মের কথাই বোঝানো হয়েছে। আরো একটি গানে পাই পিতধনের কথা—

"ও গুণী কওনা শুনি কোন গুণে মানব হয়েছে
তোমার পিতৃধনের বিনাশ করে রতি মধ্যিখানে হারিয়ে আছো।"

আর উদাহরণ টেনে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করবো না।

বাউল বলে চেতনাকে জাগ্রত রেখে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই হলো কাজ।

"সর্বদাই চেতনে থাকরে মন
ও মন অচেতনে ঘুমাইলে হারা হবি 'পিতৃধন'।"

শান্ত মনে কর্ম করে যাও, ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে মনের শান্তির বিঘ্ন ঘটতে না দেওয়াও হলো বাউলদের ধর্ম। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন। গীতায় বলা হয়েছে—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ। (১৮।৪র্থ অধ্যায়)

ফলের আকাঙ্ক্ষা না করতেই কৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

বাউলরা তাদের কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে না।

বাউল দর্শনে জীবের আদি অন্ত সূচনা ও পরিণতি অজ্ঞেয়, শুধু তার ক্ষণিক অস্তিত্বটুকু প্রত্যক্ষ।

পরাণ আমার স্রোতের দীয়া
আমায় ভাসাইলা কোন ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইৎঢালা।
আন্ধার সাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা
তার এলেতে কেবল চলে নিশুইৎ রাতের ধারা
সাথের সাথী চলে বাতি নাইগো ফুল কিনা।

এর সঙ্গে গীতার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটি স্মরণীয়:

অব্যক্তদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা" (২৮ | ২য় অধ্যায়)

এই দর্শনের মূল কথা হলো আত্মদর্শন, বাউল মতে আত্মদর্শন সম্ভব নয় যদি মায়া বিজ্ঞান না কাটানো যায়। এক কথায় শংকরের মায়াবাদই এসে যায়।

বাউল বলেছে মানুষের মধ্যেই মানুষ আছে; সেই মানুষকেই জানতে হবে তিনিই ব্যক্তিত্বে কর্তা রূপে অধিষ্ঠিত। এখানে আত্মার প্রসংগই আসে।

মায়ার কথা তাও বাউল গানে অস্পষ্ট নয়। 'অহং কর্তা' এটা ভ্রান্তি এঁরা বলেন আত্মা ব্যক্তিতে মায়ায় আবদ্ধ। 'অহং কর্তা' চিন্তাটাই ভুল চিন্তা।

আমি করছি না, আমাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। জাগতিক যা কিছু কর্ম সবই মায়াময়। বাউল বলছে :

"আমি আমার করিস রে মন আমি কে তোর তাই চিনলি না
ও তোর ব্যর্থ হলো কর্তাগিরি তবু কেন হার মানলি না।
অহংকারে মত্ত হয়ে ভূতের বোঝা মরলি বয়ে
ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে মুক্ত হবি তাও জানলি না।"

মায়াকে ভস্মের সংগে তুলনা করে বলে—"আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে" কিংবা 'অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা, সুধা তেমনি গরল মাখা' ইত্যাদি। আত্মাকে মায়াতেই আবৃত করে রেখেছে এই হলো বাউলদের মত।[২০]

আরো বহু উদাহরণ টানা যায়। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানোর কথাও বাউল গানে দেখতে পাই।

এসব কি লোক-সংগীত? কখনোই নয়। লোক-সংগীতের কারবার কঠিন বাস্তবের সংগে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই লোক-সংগীতের সম্পদ।

অনেকে বলেন, বাউল মানুষ প্রেমের কথা প্রচার করে। সকল মানুষের মধ্যে যে আরো একটি মানুষ আছে, যিনি অব্যয়, যাঁকে দেখা যায় না, সাধনা করে সেই মানুষটিকেই উপলব্ধি করতে হবে, এই উপলব্ধি আসে প্রেমের পথ ধরেই। বাউল-এর নিকট সব মানুষই সমান। লুঠেরা আর লুণ্ঠিতের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। টমসন বলেছেন, "লুঠেরা ও লুণ্ঠিতের মধ্যে 'ভ্রাতৃ-প্রেম' প্রচার করা মহত্ত্ব নয়, শঠতা।"[২১]

অবশ্যই বাউলের কোনো কোনো গানকে লোক-সংগীত বলা যায়। তবে এই গানের সংখ্যা কম।

বাউলদের সর্বত্যাগী, উদাসীনতার পরিচায়ক বেশ, তাদের যন্ত্র গায়ন রীতি এবং সর্বোপরি মাধুর্যে পরিপূর্ণ সুর, এগুলি লৌকিক। বাউল গানের সুরের আকর্ষণেই মানুষ ছুটে যায়। সংগীতের তত্ত্ব কথার আকর্ষণে নয়।

বাউল যেখানে সংগ্রামী মানুষদের পাশে এসে, তাদের বিষয় নিয়ে গান করছে, সেখানে তারা মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বিরল নয়।

গ্রন্থসূচী—

১। বাংলার লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
২। ইতিহাসের দর্শন—মনোরঞ্জন রায়
৩। ভারতীয় দর্শন—ডঃ দেবব্রত সেন

৪। Budhism—The Marxist Approach—Article written by Y. Balarammoorty

৫। ঐ

৬। ঐ

৭। ভারতীয় দর্শন —ডঃ দেবব্রত সেন

৮। লোকায়ত দর্শন (২য় সংস্করণ) ভূমিকা—ডঃ দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৯। ঐ

১০। ঐ

১১। বাঙালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

১২। ভারতের ইতিহাস—ডঃ রোমিলা থাপার

১৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—অধ্যাপক গোপাল হালদার

১৪। ঐ

১৫। The leading article in No. 179 of the Kolmische Zeiting Karl Marx.

১৬। লোকায়ত দর্শন—ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৭। ঐ

১৮। The Philosophy of our People : Presidential address at the Indian Philosophical Congress—Rabindranath Tagore

১৯। The Religion of Man—Rabindranath Tagore

২০। বাউল গান কাব্য ও দর্শন—সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১। An Essay on Religion—Gorge Thompson

লোকসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

লোক-সংস্কৃতির এক সুসমৃদ্ধ শাখা হলো লোকসংগীত। এই সংগীত লোক-সমাজ কর্তৃক রচিত এবং মৌখিক প্রচারিত হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয়, যা লোকসমাজকে প্রভাবিত করে, সেই বিষয়কে অবলম্বন করেই লোকসংগীত রচিত হয়। তবে এর মূল বৈশিষ্ট্যটি হলো—এটির মৌখিক প্রচার। লোক সংগীতের যেমন একটি রস পরিবেশনের দিক আছে, তেমনি আবার একটি ব্যবহারিক দিকও আছে।

এক সময় যখন পল্লীগ্রামে শিক্ষার সুযোগ ছিল না, তখন নিরক্ষর মানুষই লোকসংগীত রচনা করতেন, কিন্তু বর্তমানে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, সমাজের নীচের স্তরের মানুষ ও শিক্ষার সুযোগ লাভ করছে, তখন লিখিত আকারেও সংগীত রচিত হতে পারে এবং পল্লীর গায়কও লিখে নিতে পারে। কিন্তু গান করবার সময় স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই গান গাইতে হবে।

লোকসংগীতের অবয়ব প্রায়শই ছোট হয়। দুই থেকে চার কি ছয় লাইনে ভাবটি ধরা থাকে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। আট দশ লাইন থেকে ত্রিশ লাইনের লোকসংগীতও পাওয়া যায়। আখ্যানমূলক বা বিবরণধর্মী সংগীত-গুলি দীর্ঘ হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই বিষয় ও ভাবের পুনরাবৃত্তিই ঘটে থাকে। সংগীতের দৈর্ঘ্য এবং হ্রস্বতা রচয়িতাদের সামাজিক মানসিক তারতম্যের পরিচয় বহন করে।

পূর্বেই বলেছি লোকসংগীতে একটিই ভাব থাকে। এই ভাবটিই সহজ সরল আঞ্চলিক ভাষার গঠনে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত। এই সংগীতের সহজবোধ্যতা একটি বৈশিষ্ট্য। শিল্পকে সহজবোধ্য হতেই হবে। এই শিল্পের একটি প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনুকৃতির সম্প্রসারণ। এ বিষয়ে লিও: টলস্টয় তাঁর What is Art (শিল্পের স্বরূপ—অনুবাদক দ্বিজেন্দ্র লাল নাথ।) গ্রন্থে বলেছেন ;

"জনগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি আবেগ অনুভব করবার পর অপর চিত্তে সঞ্চারের জন্য যখন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, একমাত্র তখনই হয় সর্ব-জনীন শিল্পের জন্ম। (পৃ: ১০৬)"

তিনি আবার বলেছেন :

"সর্বোত্তম শিল্প বলে যা স্বীকার্য, অধিকাংশ ব্যক্তি শুধু সর্বকালের নয়—বর্তমান কালেও একই মনোভাব নিয়ে, সে শিল্পের মর্ম গ্রহণ করে থাকে, যেমন Genesis-এর মহাকাব্য, খ্রীস্টমুখ নিঃসৃত সকল রূপক গল্প, লোক কাহিনী, রূপকথা লোকসংগীত প্রভৃতি। এগুলি মানুষের বোধগম্য (ঐ পৃঃ ২০১)।" লোক সংগীতের সহজবোধ্য কথা, আঞ্চলিক সুরের বৈচিত্র্য ও গায়কী—এই তিনের সংমিশ্রণে লোকসংগীত শ্রোতৃমণ্ডলীকে যেমন এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে নিয়ে যায়, তেমনি একটি রসময় সৌন্দর্যময় অনুভূতির সৃষ্টি করে। গায়ক নিজের ভাবনাটিকে বহু মনে স্থান লাভ করাতে সমর্থ হয়।

লোকসংগীত সজীব। এর সজীবতা বৃদ্ধি পায় এই কারণেই যে লোক-সমাজ বহিরাগত বিভিন্ন উপকরণকে সমাজের উপযোগী করে সাঙ্গীকৃত করে নিতে পারে। ক্রম পরিবর্তনের ধারায় গীতিরূপ ও সুরকে কোনো মতেই বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। তবে পরিবর্তনটা অবশ্যই হতে হবে কৃষি নির্ভর সমাজের উপযোগী। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ধনিকতন্ত্রের অর্থনীতি, কৃষক সমাজকে অধিকতর সংকটের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কৃষক সমাজ সংগীত বিষয়ে রক্ষণশীল হয়ে উঠছে; এবং অতি কষ্টে তাদের নিজস্ব সম্পদকে আঁকড়ে ধরছে। তাও কি পারছে বিকৃতির হাত থেকে সংগীতকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে? 'দেখা হবে বাবুর বাগানে'র মতো সংগীত লিখিত হচ্ছে এবং বহুল প্রচারিত হচ্ছে।

অনেকেই Traditional লোকসংগীতগুলিকেই, লোকসংগীত বলেন। তাঁদের যুক্তিও আছে। যুক্তিটা এই যে, অগ্রসর সমাজে লোকসংগীত রচিত হবার সুযোগ নেই। তাই যদি হয় তবে, লোকসংগীতের বিবর্তনও ঘটবে না, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখছি প্রাচীন লোকসংগীতগুলির স্থানে নূতন লোকসংগীত সুরের কাঠামো ও গায়কীকে অবিকৃত রেখে রচিত হচ্ছে।

অতীতের প্রতি এই যে আকর্ষণ এ কি ইংরাজী শব্দ Popular antiquities থেকে এসেছে? Folklore কথাটি চালু হবার পূর্বে পূর্বোক্ত শব্দ দিয়েই পুরাতন রীতি-নীতি-সংস্কার-আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝানো হত। Folk lore কথাটির স্রষ্টা William Thoms, সাল ১৮৪৬। এ ছাড়া আরো একটি শব্দ টিউটোনিক দেশগুলিতে প্রচলিত আছে, তা হলো জার্মান শব্দ Volkskunde এঁদের বিচার্য গ্রামীণ লোক জীবন। আবার স্ক্যানডিনেভিয়ান Folklorist গণ লোকজীবন নিয়েই আলোচনা ও গবেষণায় রত।

লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দগুলি যুগ্ম শব্দ। এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলির সঙ্গে 'লোক' শব্দটি বর্তমান। লোক শব্দের যথার্থ অর্থ যদি পাওয়া যায় তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ত হয়ে যায়। লোকায়ত বলেও একটি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'আয়ত্ত' শব্দের অর্থ করেছেন সম্পূর্ণভাবে চাষ কবা। সবটি গঠিত হয়েছে এই ভাবে আ+যৎ+অ। 'যৎ' ধাতু মানে কাজ করা, চেষ্টা করা। লোক (folk) এর অর্থ অনেকেই করেছেন। অভিধানে লোক শব্দের অনেক অর্থ আছে, সে সব অর্থ আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করবে না। লোক শব্দের অনুরূপ দুটি শব্দের উল্লেখ করেছেন মনিয়ের উইলিয়মস্। একটি লাতিন, অন্যটি লিথুনিয়ান। লাতিন শব্দটি Lucus, লিথুনিয়ান শব্দটি Laukus লাতিন শব্দটির অর্থ Clearing of forest (বহু পূর্বে চাষ করবার জন্য এ কাজ করা হতো, এখনো হয়।) লিথুনিয়ান শব্দটির অর্থ চাষের জমি। তিনি আরো বলেছেন, "সংস্কৃতেও লোক শব্দের আদি অকৃত্রিম অর্থের সঙ্গে যে চাষের জমির সম্পর্ক ছিল না এমন কথাও খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় না, কেন না শুরুতে লোক শব্দের আগে একটি উ থাকত—উলোক। এই উ-লোক উরুলোক। এবং এর মানে হলো জমি মাঠ ইত্যাদি। (লোকায়ত দর্শন: ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা যায়, 'লোক' শব্দের অর্থ যারা চাষ করে, ফসল ফলায়।

এখানেও 'কিন্তু' আছে। যারা চাষ করে না, ফসল ফলায় না তাদের কি বলা হবে? যেমন, তাঁতী, কামার, কুমার, জেলে, তিলি, মাল, মালী আরো বহু জাতি। আমার বিবেচনায় গ্রামে যাঁরা শ্রম ক'রে জীবন ধারণ করেন তাঁরাই লোক। মার্কস তাঁতীদের লোক সঙ্গীতের উল্লেখও করেছেন (Marx and Engels, Collected Works. Vol 3, Moscow, 1975. P 201) Weavers' Song এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। মার্কস বলছেন, "First of all recall the song of the weavers, that bold call to struggle, in which, there is not even a mention of hearth and home, factory or district but in which the proletariat at once, in a striking, sharp unrestrained and powerfull manner, proclaims its opposition to the society of private property. The Silesian uprising begins precisely with what the French and English workers' uprising end, with consciousness of the nature of the proletariat."

মার্কসের এই উক্তি থেকে একটি সত্যের আলো আমরা পাই, তা হলো এই যে লোক সঙ্গীতে কেবল যে গ্রামীণ জীবনের কথাই থাকবে, তা নয়। শহরের

সর্বহারাদের সংগ্রামের কথাও থাকতে পারে। যা বলতে চাইছিলাম, তা হলো এই, গ্রামীণ সংহত সমাজে যাঁরাই বাস করেন তারাই লোক—ব্যক্তির পার্থক্য থাকলেও।

· কেউ কেউ বলেন, বোধহয় অনুন্নত সমাজের লোককে বলা হয় Folk এবং উন্নত সমাজের লোককে বলা হয় People।

উন্নত অনুন্নত শব্দদ্বয় আপেক্ষিক। প্রতি সমাজই তার পূর্ববর্তী সমাজ থেকে উন্নত—এই সূত্র অনুযায়ী শিল্পায়নের যুগে তার অবলুপ্তি ঘটেছে বা অবলুপ্তির পথে, ধরে নিতে হয়। এ কথা মন মানে কই? যখন দেখি আজও ভারতবর্ষে সত্তর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন।

প্রশ্ন আসতেই পারে ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে কি 'লোক' আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে, ভারতীয় সমাজেব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কৃষকসভার প্রয়াত নেতা শান্তিময় ঘোষ 'মার্কসবাদী পথ' প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় যা বলেছেন তাই তুলে দিচ্ছি :

> "স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজির নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার সরকারের ভূমি নীতি ও কৃষি ব্যবস্থা দেশের মাটিতে কার্যকর করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। আগেকার বড় বড় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের সংস্কার ক'রে ধনতান্ত্রিক জমিদারে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। ভূমি সংস্কার তাদের লক্ষ ছিল না—লক্ষ্য ছিল জমিদারী সংস্কার। জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটেনি।"

উক্ত বিশ্লেষণই বলে দিচ্ছে যে এখনো এ দেশে মধ্যযুগীয় সম্পর্কের অবসান হয়নি। প্রান্তীয় চাষী মজুরে পরিণত হচ্ছে। লোক টিঁকে আছে, টিঁকে আছে লোক সঙ্গীত। শুধু টিঁকে থাকা নয় নূতন লোক সঙ্গীত রচিতও হচ্ছে, যা যুগ চৈতন্যকে প্রকাশ করছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের লোক সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপের বিষয়টির উল্লেখ না করে পারছি না। লোক সংস্কৃতি (যার মধ্যে লোক সঙ্গীত, লোক নৃত্য, লোকনাট্যও নিহিত) এই বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিকাশের সম্ভাবনা যদি না থাকত, তবে অহেতুক একটি পর্ষদ গড়তেন না। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২ সালের রাজ্য লোক সংস্কৃতি উৎসবের শুভেচ্ছা বাণীতে বলেছেন : "লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশিষ্ট ধারা সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। এই ধারার লালন ও অধিকতর পুষ্টির জন্য আমাদের এখন আরও সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের লোক সংস্কৃতির মূল সুর ও আঙ্গিক কৌশল জনগণের কাছে খুবই

আদরণীয়। লোক সংস্কৃতি চর্চা যত বেশী সংগঠিত হবে ততই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম সাফল্য লাভ করবে।”

এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হচ্ছে যে লোক সংস্কৃতি মৃত নয়, অচল নয়। তাকে ‘পুষ্ট’ করাই এই মুহূর্তের কাজ। এই পুষ্টতা আনতে গেলে সংগীতের অবয়বে নূতন অভিজ্ঞতার খোরাক যোগান দিতে হবে।

যাই হোক, পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এখনো এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পঃ বাংলায় ৭০·৬৪ ভাগ ক্ষেতমজুর, ২৪·২৬ ভাগ নিজ চাষের কৃষক, ৩০·০০ শতাংশ মানুষ যাঁরা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত, লোক-সংগীতের চর্চা করেন এবং নূতন নূতন গানও রচনা করেন।

এ বিষয়ে মার্কসের কথাটি স্মরণীয়:

> As regards arts it is well known that some of its peaks by no means correspond to the general development of society nor do they therefore to the material substructure (Economy Manuscripts 1857-58—K. Marxs)

এবার কয়েকটি প্রাচীন এবং আধুনিক গানের উদাহরণ দিই:

দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় গ্রামের মানুষ জেনেছে যে আমিনবাবু ক্ষেতের থামায় লাল নীল পতাকা দিয়ে জমি মাপ করলেই খাজনা বাড়ে। তাই আবার আমীনকে পতাকা দিয়ে ক্ষেত চিহ্নিত করে মাপ করতে দেখে গ্রামীণ মহিলারা বুঝে নেন এবার খাজনা বাড়বে। মনের ভাবটি ভাদু গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

লাল ফতকা নীল ফতকা ক্ষেতের মাথাতে
আমিন বাবু মাপ করিছে জমা বাড়াতে

এখন এই গানটি আর শোনা যায় না; এর জায়গায় নূতন গান শুরু হয়:

“খাজনা মকুব হবার টুসু চষছে নিজের ক্ষেত
বীচ ধান সার দিছে ইখন চ্যাররা পিটে পঞ্চায়েত।
সেচের কথা ভ্যাবছে সরকার লেভী আদায় নাইক আর
সনার ধানে ভ্যরবেক টুসু ইবার চাষীর ক্ষেত খামার।”

ভাওয়াইয়া লোকগীতি উত্তর বাংলার কুচবিহার সংলগ্ন আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও পশ্চিম-দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে প্রচলিত, ভাওয়াইয়া প্রেম-সংগীত। প্রেমিককে জীবনে না পাওয়ার বিরহে প্রেমিকার অশ্রুসজল বিবৃতি।

উক্ত অঞ্চলে 'ব্যাচে খাওয়া' বলে একটি কথা চালু আছে। এর অর্থ কন্যাপণ নিয়ে কন্যার বিয়ে দেওয়া। (এই প্রথা বহু জাতির মধ্যেই আছে।) অর্থলোভে অনেক সময়েই কন্যাকে অপাত্রে দান করা হয়। এই অন্যায় রীতির বলি কন্যারা। মানসিক দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এ এক করুণ চিত্র। নারীর বিরহ ব্যাকুলতা যেমন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের মর্মবাণী।

ব্যাচে খাওয়া'র পর নারীর মর্ম-বেদনার চিত্র :

ও তোর টাকা খাইয়া দুখত বান্ধিলী
ডাঙাও তোর গেয়া,
য়্যামন ব্যাসালেন আর মুলুকও
বরকি পালেন গেয়া,
ও মোক টাকার লোভত বুড়াকে দিলেন
আর মুলুকও বর নাই পালেন
মোক কি সবাই স্যানে বুড়িয়াই ॥
ও আই কাহ কছে জ্যাঠাই, খুড়াই
কাহ কছে বুড়িয়াই বুড়িয়াই
নওজারী করার যে মানষি নাই ॥
ও আইবুড়া বরের ফ্যাদলাং
দিন বাইতে লাসে পান
গুয়া ডুকাইতে কি যাবে জান ॥

(গানটি লোকসঙ্গীত গায়ক বন্ধুবর কালী দাশগুপ্তের সৌজন্যে। গানটির অর্থ মেয়েটি ঠাকুমাকে বলছে, যারা টাকার লোভে আমাকে বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে তাদের মুখে আমি ঝাঁটার বাড়ি মারি। বরের দেশে আমাকে কেউ নূতন বৌ বলে না, বলে খুড়ি মা, জ্যাঠাইমা, অথবা বুড়ি বুড়ি বলেই ডাকে, বুড়োর জন্য সুপোরী ছেঁচেই জীবন কাটবে, বুড়োর যে দাঁত নেই।)

বর্তমানে রাজবংশীদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। রাজবংশী মেয়েরাও ইস্কুল কলেজে পড়ছে। চেতনারও বৃদ্ধি ঘটছে। মেয়ে তার প্রেমিককে বিবাহ করার দাবিও রাখছে। এমন কি রাজবংশীভুক্ত নয় এমন সমাজের ছেলের সঙ্গে বিয়েও হচ্ছে, এ তথ্য দিয়েছেন শিল্পী সুমিত্রা রায়, প্রযত্নে সিদ্ধেশ্বর রায়, গ্রাম ভোটপাড়া, পোঃ টেংরামারি জলপাইগুড়ি।

বর্তমানে মেয়েকে আর ব্যাচে খাওয়া নেই, তার পরিবর্তে পাত্রকেই অর্থ সামগ্রী দিয়ে আনতে হয়।

যেমন রাখালের গান, মাহুতের গান, মৈষালের গাড়িয়ালের গান চলে তার সঙ্গে সঙ্গে পণ প্রথার বিরুদ্ধেও ভাওইয়া গাইতে শুনেছি। গানটি রচনা করেছেন শশীন কর। গানটি এইরূপ:

মুই কালা কইনা ছাওয়া
তাতে না হয় মোর বিয়াও
ঘটক ঘোরে দিনে আমার বাড়ি,
খাওয়া দাওয়া কত কদতা
খরচা হইলেক হাজার টাকা
এলাত মোরে না মিলিলেক জুরি ॥
আই এ, বি এ, ম্যাট্রিক ফেইল
হালুয়া চাষা কত গেইল
মোকে কারো মনও নাহি ধরে,
সাইকেল ঘড়ি রেডিও টি ভি
কারো দাবি ভটভটি
খাট খানো দেওয়া যাবে দানে ॥
বারা ভুকা চরা ফোটা
রান্ধন বাড়ন গুণের কাতা
আজি কালি কাহোয় পোছে না
গুণের কদর আজি নাই
নগদ টাকা সগায় চায়
নগদ টাকার চলছে বেচা কেনা।

আরো একটি গান, —লোক কবি নিবারণ পন্ডিতের রচনা

আরে ও মোর দরদীরে ভাই
চল করি চ'ল বাঁচিবার লড়াই
দিনে রাইতে খাটিয়া মরি
চিন্তায় পোহায় রাত
মাইয়া ছাওয়ায় রুটিরে চেনাই
না পাই প্যাটের ভাত রে ॥
ধনাগুলার বোঝা দেখং রে—
ভগবানে বয়,
গরীব চাষীর ভিত্তিরে চাইবার
দরদী কেউ নাই রে।

কাওয়া মরিলে কাওয়া কান্দেরে
হয়া একে ঠাই
গরীব মরিছে গরীব ভাই সব
আয়রে ছুটে আয়রে ॥

নব বধূর প্রতি শ্বশুরালয়ে যে অসহনীয় অত্যাচার চলতো আজো তার পরিসমাপ্তি ত হয়ইনি বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বধূ হত্যা প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে দেনা-পাওয়া নিয়েও বধূকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হত, তা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ভাদু গানে, জাগুয়া গানে, সাঁওতালী গানে বহু গান আছে। কিন্তু সেই যন্ত্রণাও হয়ত সহনীয় ছিল, প্রাণে মরতে হয়নি। এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও বধূকে হত্যা করা হয়, বধূকে পুড়ে মরতে বাধ্য করা হয়, বা বিষ খেয়ে জীবনের সব সাধ আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিতে হয়। এ গানেও বিবর্তন ঘটেছে। একই গান আর গীত হয় না।

অতীতে গানের নমুনা :—

১। শুন পিতা বলি কথা
শ্বশুর ঘরের যন্ত্রণা
মাথার তেল খুঁজতে গেলে
কত করে গঞ্জনা। (ভাদু)

২। শাউড়ী খায় ডাল ভাত
হামে খাই তিতা লাউ রে করলা। (জাওয়া)
বা
বালি ছাতুর তরকারি বাস্যাম দিতে যাব ল
খালভরাদের হাল কত ধুরে।
খালভরাকে খাতে দিলে চুলহা শালে বসে ল
উচিত কথা বলতে গেলে পয়না নিয়েঁ উঠে। (জাওয়া)

৩। হেঁ হো হেঁ মারি মা বাগাঞ্চি মে
আপা বারে হঁক্ কুশী গেয়া
খানে খানে গিঞ্চ গণঃ আক্
এম্ কাতিঞ্চ মে কুওঁয়ারী মন।

(বাংলা—আমাকে তালাক দিলে মা বাপ আমার খুশিই হবে, তারা আবার এখানে সেখানে বিয়ের কথা পাকাপাকি করবে, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে আমার কুমারী মনটি ফিরিয়ে দাও)

(সাঁওতালি গান)

৪। আমাদের টুসু ভাগে চষে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
বাছ্যা বাছ্যা কামিন ক্যবর দাঁত কাল কাঁকাল সরু।। (টুসু)

৫। এ বছর হয়নি ধান, তাই হুঁয়্যাছে অনেক টান
মহাজনের ধান দিব কিসে,
বীচ ধান ছিল যত, সব ক্যরেছি উদ্দব্সাৎ-অ
আগত্ বছর কা লাগাম চাষে।
লাঁগল ছাগল গরু ভেড়া, বিকাই গেল কাড়া ভড়া
আইত সুবদনী কাছে করিস মনমানী
পঁটলা পুঁটলি বাঁধগে তাড়াহুড়া। (ঝুমুর)

৬। ১২৩০ সালে পঞ্চকোটে বর্ধমানে এবং অন্যান্য স্থানে যে বন্যা হয়েছিল তার একটি ছড়া আছে। ছড়াটি অতি দীর্ঘ। একটুখানি তুলে দিলাম,

নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনাগোনা
দু'ধার মিশিয়ে ভাঙে শেরগড় পরগণা।।
এল বান পঞ্চকোটে, লিলেক লুঠে ভাংগলো বাজোব গড।
দুর দুর শব্দে ভাঙে পর্বত পাথর। ইত্যাদি। (বন্যা)

গানটিতে শুধু ভাংগার বর্ণনাই আছে। আরো অসংখ্য গানের উল্লেখ করা যায়, যথা—বোলান, ময়ুরপংখী সন্ধ্যা, বাদাই, মাহুরী, ঝাপান, তরজা কবি, ইত্যাদি। কিন্তু তা করতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে।

সমাজ চলমান—তার অন্তরদেহে অনবরতই একটা শ্রেণী দ্বন্দ্ব চলছে, এবং তার ফলে চেতনায় বিকাশ ঘটছে। লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এই ক্রমবিকাশমান চেতনার স্বরূপটি ধরা দেয়। সংগীতের বিবর্তন হয়।

ইদানীং কালে উপরিউক্ত গানগুলি খুব একটা গাইতে দেখা যায় না, তার পরিবর্তে নূতন নূতন যে গান গীত হচ্ছে, তারই নমুনা দিই।

ভাদুগানে বধূ নির্যাতন এবং পণ প্রথার বিরুদ্ধে, কুমারী মেয়েরা আজ গাইছে :—

১। ওলো হীরা ওলো পুষ্প স্ট্রাইক করি জনে জনে
বিয়ে মোরা করব না ভাই দুঃখ নাই মনে।

বা

ছেলের মত পড়ব শিখব গো
বিয়ে নাইত না হলো
করব চাকরি ফিরব বাড়ি আনব টাকা

ছেলের চাটি হবে মাটি লো
কলের চাকা ঘুরিল। (ভাদু)

২। খিল যে খেতেঁ দেওরা বকলি না চরে
ঘরে লেখেঁ দেওরা ঘড়োয়া দৌড়াও এ
কি মোরে লেখেঁ
তুহি যে যাবে দেওরা মালঙক দেশে
আনি দিহা দেওয়া শাড়িয়া সন্দেশ-
আনি দিহা !
মর যে দেশে ভৌজি শিশির বহুত
ভিজি যাতো সে ত শাড়িয়া সন্দেশা
কি ভিজি যাতো।
মর যে দেশেঁ দেওরা শুকল বরিষা
শুখাই লিব দেওরা শাড়িয়া সন্দেশা
শুখাই লেবো। (জাওয়া)

গানটি প্রশ্নোত্তর মূলক। জাওয়া গান পুরুলিয়া অঞ্চলের। পুরুলিয়া বাঁকুড়া কয়েকটি জেলা খরাপ্রবণ এলাকা। খরা একটি অভিশাপ। এই জন্য কোনো সাধই পূর্ণ হয় না। গানটিতে 'ভৌজি অর্থাৎ ভ্রাতৃবধূ তার দেবরের কাছ থেকে চাইছে শাড়ি আর সন্দেশ। দেবর অজুহাত দেখাচ্ছে সেখানে সে যাচ্ছে সেটা শিশিরের দেশ, শাড়ি সন্দেশ ভিজে যাবে। ভৌজি বলছে, আমার দেশ খরা এখানে সূর্যের তেজ বেশী কাপড় সন্দেশ শুকিয়ে নিবে।

গানটিতে একটি সুখী জীবনের জন্য যে আকুলতা তা ধরা পড়েছে।

৩। আদিবাসী হড় বয় হা জওরিবুন তায়নম আলন
দে জন তাড়াম লহোয় বয়হা সারশলে ডাহারতে।
তুল আরণ আবা : কাশিভ আজ ব্যথরণ বিলোম
দেহন লাহায় বয়হা মারশাল ডাহার তে
দিশোর গেহো আদিবাসী ভিহিং লিকান দিনরে
গিদায় হুল ভগনাডিহি টাশিড বয়হা বাবুন হিডিং আ
দিশো আবুন তায় মে দারাম সেটের এনা সিদায় হুল
ভ্যানাডিহি টাশিডং বয়হা হিডিং

(পৃথিবীর আদিবাসী ভাইরা সব কিছুতেই পিছিয়ে আছি। চল আমরা উজ্জ্বল পথের দিকে এগিয়ে যাই। আর আমরা দেরি করব না। লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাব। আজকে স্মরণ ক'রে দেখ সেই রণক্ষেত্র ভগনা-

ডিহি মাঠটা। ঐ মাঠটাকে আমরা কোনো দিনই ভুলব না। বর্তমানেও আমাদিগকে রণসাজে সাজতে হয়েছে। সেই রণক্ষেত্র ভগনাদিহি মাঠে যেভাবে সেজেছি সেই ভাবে। অতএব সে রণক্ষেত্র ভগনাডিহি মাঠকে ভুললেই চলবে না।

৪। আগের গানে টুসু বলদ নিয়ে চাষ করতে যাবার কথা আছে। কিন্তু এই চাষ করা কি সম্ভব ছিল, চাষ করলেও সে হয়ত বর্গা চাষী, হয়ত ফসলও ঘরে আসত না। এলেও ছিল লেভী, চোখ রাঙানী। সর্বদাই থাকতে হত দুরু দুরু বুক নিয়ে। এই টুসু গানে বিবর্তন লক্ষিত হয়।

টুসু সনার ধানে
পৌষ মাসেতে পুজব তোমায় যতনে।
বদের গড়া জোতদারেরা গো
লিত ফসল জোর করে।
ইবার লিব ফসল আধা-আধি
ভাগ চাষেরই আইনে।।
কত আইলো কত গেল গো
কেউ দেখলেক নাই মোদেরে।
ধন্য বামফ্রন্ট, জোর বাড়ালে
কাস্তে হাতুড়ির টানে।।
ভূমিহীনে কৃষি ঋণ যে গো
দুবিঘা ভুঁই একট হাল।
ই ভুঁই জোতদার কাড়তে আইলে
দিব বাধা মাঝ খানে।।

৫। খরার জন্য ধান হওয়ার আক্ষেপ দুর্ভাবনার পরিচয় আগে দিয়েছি। এখনো যদিও চাষ প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে তবু দেখা যায়, চাষ না-হওয়ার জন্য মহাজনের ধান শোধ করার দুঃশ্চিন্তা নেই। কেন নেই, নীচের গানটিই তার নিদর্শন:

যারা আছে গুহাল চাষা
তাদের কিছু আছে আশা
বাইদ চাষী ফাঁপরে পড়েছে
রং মায়া মেঘে আশা দিয়ে গেছে।।
যত ছিল টাড কানালি
ফাট্যা হ্যালো চেলি চেলি

ফুটা ধান সব চাপা হঁয়্যা গেছে।
নদী নালা পুষ্করণী
শুকাই গেল নাই পানি
শুকাই গেল নাই পানি
আর কি ভাই বাঁচার উপায় আছে ॥

১৯৭৯ সালে,

খরার কথা সলাকৎ বলে
আশা ভরসা বামফ্রন্ট সরকার আছে।

পূর্বে ১২৩০ সালের বন্যার ছড়াটির কিয়দংশ তুলে দিয়েছি। ছড়াটি দীর্ঘ, এতে শুধু আছে, সেই বন্যা কোন্ দিক দিয়ে গিয়ে কোথায় কি ভেঙেছে তারাই বিবরণ। মানুষের অশেষ যন্ত্রণার কথাও আছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার উপশমের কোনো উল্লেখ নেই। ১৩৮৫ সালে যে বিধ্বংসী বন্যা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল, তা নিয়েও গান রচিত হয়েছে। এ গানটিও দীর্ঘ।

১৩৮৫ সালে এবার বন্যাতে দেশ ভাসালে
আমি অবাক হলাম ভেবে মলাম
এমন বান দেখি নাই বাবার কালে।
১১ই আশ্বিন বৃহস্পতি বার
বন্যা এসে করল ছারখার
কত গবাদি পশু ভেসে গেল
মা হারা শিশু ছেলে।
পশ্চিমবঙ্গের জেলা ষোলোটা
চারটা বাকী ভাসল বারোটা
কত বসে গেল দালান কোটা
কত অকালে প্রাণ হারালে।
পঞ্চায়েতের কত মেম্বর
গাঁয়ের যুবা পুরুষ দল
মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে
নিজেদের পরাণ দিলে।
দেশের সরকার
কত করলে উপকার
কাপড় কম্বল উপকার
করে হেলিকপ্টার,

গুড় চিড়ে আর. পাঁউরুটি
ওই দেখো উপর থেকে দেয় ফেলে ॥

আশা করি বিবর্তনের রূপটি প্রকাশ করতে পেরেছি।

আরো সব এমন লোকসংগীত রচিত ও গীত হয়েছে, যাকে পুরোপুরি রাজনৈতিকই বলা যায়। গোঁড়া লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ এগুলিকে লোকসংগীত বলবেন কি না জানি না তবু কয়েকটি উল্লেখ করার প্রলোভন ত্যাগ করা যায় না, তাই উল্লেখ করছি।

নির্বাচন হলো একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের চেহারাটি গ্রাম্য নারীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ:

১৯৫৮ সালে ভোটের ব্যাপারে
ক'টা পার্টি দাঁড়াল বেংগল বিহারে
ভোটের জন্য মহৎ লোকেরা ফিরিছে দ্বারে দ্বারে
যার ভিজিট দিলে পাই না দেখা, দেখলাম অনাথ ডাক্তারে।*
মেয়ে-ছেলে সংগে নিয়ে এসেছিল মটরে।
যার যাকে খুশি ভোট দিল পেল না কেউ জোর করে।
কমিউনিস্ট পার্টি দলবদ্ধ হয়ে ফিরেছে গ্রাম গ্রামান্তরে।
তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বেড়াইত মিটিং করে
ইত্যাদি।

গত বিশ্বযুদ্ধে জাপান কলকাতায় কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করেছিল। প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দরবৃদ্ধি ঘটেছিল। দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গান—

জাপান বিবেচনা
টাকায় এক সের চাল বিনা ভাত খেলাম না
সোল্‌জার বুলে দেশে দেশে লো
কেরাসিন তেল মিলে না
দশ টাকা সের দেশী চিনি
তাও ত কিনতে পেলাম না।

বা

গাঁ ঘর সব খালি হুয়্যা গেল
বাঁচার আশায় গাঁ ঘর ছাড়া গেল ॥

* অনাথ ডাক্তার কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন।

বৌ বিটির হাত ধরে
গেল সবাই শহরে
টিনের কেটা হাতে নিয়ে মাড় মাগিল ॥
ভাতের মাড় তাও জুটে না
কুকুরের সাথে খানা পিনা—
শেষে সব উপাসে মরিল ॥

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। স্বাধীন ভারতের যে এক সুখী জীবনের চিত্র গড়ে তুলেছিল গরিব মানুষজন শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত, তা চুরমার হয়ে গেলো। গ্রামের নির্বিত্ত চাষীর মনে আবার সেই যন্ত্রণা। গরিব চাষী তাই তার অশ্রু ভেজা সঙ্গীতে গাইলো—

সন ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা হে
কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে
ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী
ফাঁসীর মঞ্চে দিল বলি
তাদের জীবন বৃথাই গেল চলি
বেইমান আপোসকামীদের তরে হে।
বেইমান স্বদেশীদের তরে হে ॥
রং তাই যত দিন যায়, অভাব বেড়ে যায়, গরিব বাড়ে দেশেরে ॥
যেমন অলগ পুইয়ের শ্যাওড়া গাছ আর পুঁজিবাদের সর্বহারা হে,
গরিব বিনে বাঁচতে লারে, ভাইরে জোতদার জমিদার
সমাজতন্ত্রে থাকবে না শ্রেণী শোষণ অত্যাচার ॥

শহীদদের স্মরণ করে শপথগ্রহণের গান ;

রং—সাথী শহীদের ঋণ শোধিব যেই দিন
সেই দিন কত দূরে রে
সাথী-হারা ব্যথা, প্রাণে আছে শিখা
বিক্ষোভ হুংকারে রে ॥
কতশত মা সিঁথির সিন্দুর হারা
কত শত বোন পাগলের পারা
জোতদার জমিদারের অত্যাচারে রে ॥
আজ পুত্র হারা মা, স্বামী হারা বোন
কাঁদিছে অঝোরে ঝুরেরে ॥

আজ চোখের সামনে বোনের অপমান
মানব সমাজে মরণ সমান
কত সইছে নীরব ব্যথারে ॥
যত বিচ্ছেদ ব্যথা, অভিযোগ কথা
জাগে সর্বহারার মাঝারে ॥
বুকে জমাট ব্যথা চোখের অশ্রু জল
শহীদের রক্ত হবে না বিফল
আমরা রক্ত মাখা যাযাবর যে !
হোক না পথ পিছল
ছিঁড়িব শিকল
এসো উর্দ্ধে পতাকা তুলে হে ।*

স্বাধীনতার পূর্বে অসংখ্য শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের মৃত্যুঞ্জয়ী আন্দোলন হয়েছে স্বাধীনতার পর সে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় নি, যার ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এতে কোনো সমালোচক যদি নাসিকা কুঞ্চিত করেন বলার কিছু নেই। এইটুকুই বলতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর লোক শিল্পীদেরও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়েছে। তাঁরা শোষক শোষিতের পার্থক্যটা চোখের সামনে দেখছে। তাঁদের বুকের বল আশার আলো, ভাঙা বুকে একটি অপূর্ব সাড়া তুলেছে। মনে রাখতে হবে, শুধু কৃষকের নয়, শ্রম জীবনের ফসল এই লোকসংগীত।

আজো সংগ্রাম চলছে, তাদের সংগ্রামের পাশে বামফ্রন্ট সরকার সহযোগী শক্তি রূপে দন্ডায়মান, তাই লোকসংগীতের অতীতমুখিনতা বড় বেশী আর লক্ষিত হয় না।

তাই শোনা যায়—

এক জোটে সব ক্যরব লড়াই জমিদারের বিরুদ্ধে
গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুরের মজুরিটা বাড়াতে।

কিংবা লোক কবি তার জীবনের অভিজ্ঞতায় চিনে নিয়েছে শত্রু-মিত্র, তাই গানে তা ব্যক্ত করতেও কুন্ঠিত হয় না।

সাবাস করি গান্ধীবাদীর দল
মুখেতে অহিংসা বাণী, অন্তরেতে খল

* গান দুটি বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের নব মাহাত লিখিত

মুখে বলে মধুর বুলি
বগলেতে আছে গুলি
অহিংসা পরায়ণ কংগ্রেস
হিংসাকে করেছে সার,
পঞ্চাশবাদীর কংগ্রেসীরা
থাকবে এবার হুঁসিয়ার।

শুধু কি তাই, তারা আজ নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও শপথ নেয়।

কংগ্রেসীদের কুশাসনের হলো অবসান।
শুন গরীব দুঃখী সর্বহার দল
জোট বাধিয়া বেনামী জমি কর ভাই দখল
(ও ভাই) মুখের অন্ন কাড়িছে যারা
বহাও তাদের রক্ত বান।

উদাহরণ বাড়িয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করতে চাই না! আগেই বলেছি লোক সঙ্গীতের সুর এবং গায়কীই হলো লোক সঙ্গীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এইগুলি যথাযথ রেখে যদি লোক সঙ্গীত উপস্থাপনা করা হয়, তাহলে তা লক্ষ মানুষকে উল্লসিত করে; বিষয় তার রাজনৈতিক কিনা তা বিচার শ্রোতৃমণ্ডলী করেন না। যে গানগুলি আমি উল্লেখ করেছি, সেই সব গান বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি উৎসবে পরিবেশিতও হতে দেখেছি। এবং শ্রোতাদের আবেগ মথিত হর্ষধ্বনি শুনে মনে হয়েছে এই সব গান হাজার হাজার শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। অবহেলিত অনাদৃত লোকশিল্পীরাও নতুন অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তাঁরাও যে শিল্পী, তা উপলব্ধি করেছেন। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়তা এসেছে। তাঁরা আজ সম্মানিত।

লোক সঙ্গীতের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জীবনে যেমন প্রেম আছে, তেমনি আছে জীবনকে মধুময় করার জন্য সংগ্রামও। রাজনীতিকে জীবন নীতি বলে যাঁরা মনে করেন না শুধু তাঁরাই কবিতাতেই হোক আর গানেই হোক কিম্বা লোক সঙ্গীতেই হোক, রাজনীতির গন্ধ পেলে, তাকে বাতিল করে দেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য কবি হয়েও এঁদের কাছে কবি হতে পারলেন না।

লোকসঙ্গীতের বাঁশী কখনো কখনো অসিতেও রূপান্তরিত হয়, তরে পরিচয় আমি পরের প্রবন্ধে উল্লেখ করবার প্রয়াস করবো।

বস্তুবাদী জীবন মুখীনতাই লোকসঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করে, এবং এটিই

লোকসংগীতকে চালনা করে। যে গানে এই জীবনমুখীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না তাকে কি ঠিক লোকসংগীত বলা যায়? এক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচারের ক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শনই একমাত্র চালিকা শক্তি। এই জ্ঞান না থাকলে অনেক সময়েই বিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক।

লোকসংগীত শুধু আনন্দ বিতরণ নয়। শুধু অতীতের দোষ গুণ কীর্ত্তন করা নয়, শুধু আসরে পরিবেশ করে হাততালি পাওয়ার সংগীও নয়। তার একটা লক্ষ্যও আছে, তা হলো এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শোষিত শ্রেণীকে শোষণ-শৃংখল ছিন্ন করার প্রেরণা দেওয়া। কিন্তু এই প্রেরণা লোক কবি বা লোকসংগীত রচয়িতা যদি নিজে অন্তরে উপলব্ধি না করেন, অন্তরের তাগিদ যদি না থাকে তবে তা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে না।

প্রাগার্য যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক পরিবেশ জীবন ধারণের অনুকূল ছিল না—এ কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশকে পরাজিত করে তাদের আদিম হাতিয়ার দিয়েই। এবং এই সংগ্রামেরই একটা অংগ হিসাবে দেখা দেয় নৃত্য, চিত্র, যাদুর। তাই দেখি সেই যুগে মানুষ ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা না ঠুকে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুক লাভ করবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে গান করত নাচত, সংগে সংগে লাভ করত আত্মবিশ্বাস। নিষ্ঠুর প্রকৃতির সাথেই ছিল তাদের সংগ্রাম। যখন শিকারে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে তার গুহার গাত্রে শিকারের করেছে চিত্র অংকিত অথবা সংঘবদ্ধভাবে শিকারের গতিবিধির অনুকরণ করে নৃত্য করেছে। তাদের এই চিত্র এবং নৃত্যের মূলে ছিল প্রচুর শিকার পাবে এই বিশ্বাস। আজ এই সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের মূলে যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব ছিল, তা আজো ধনতান্ত্রিক বা উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে টিঁকে আছে। এখানে মানুষের মুক্তির পথে প্রধান বাধা ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র, কাজেই তার বিরুদ্ধে লোকসংগীত রচিত হওয়াই সংস্কৃতির স্বাভাবিক ধর্ম এবং এই ধর্ম লোকসংগীতে দেখতে পেলে সেই হবে লোকসংগীতের বিকাশ বা রূপান্তর। বিরাট বনস্পতির শিকড় মাটির অভ্যন্তরে, কিন্তু শাখা প্রশাখা আকাশের পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, মাঝে মাঝে পাতা তার ঝরে যায়, কিন্তু আবার তাতে নূতন পাতা গজায়, ঠিক এমনিই হলো লোকসংগীত। কাজেই বলতেই হয়, লোক সংগীতের মৃত্যু নেই।

আমরা জানি, লোকসংগীত শুধু পল্লীর নিরক্ষর বা সাক্ষর মানুষই গান করেন না। এই লেখক এক বিরাট শ্রমিক এলাকায় বাস করেন, যার চারিপাশেই বড়ো ছোট শিল্প, এই সব শিল্পে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা ভারতের নানান রাজ্য থেকে আসা মানুষ। এদের আনন্দ বিনোদনের মূল বিষয় হলসংগীত; লোক-

নাটা লোকনৃত্য। অপূর্ব তার সুর ও বিষয়। শ্রমিকরাও এখনো লোক-সংগীতকেই আঁকড়ে আছেন, লালন পালন করছেন প্রাণ ঢেলে। এঁদের হোলি, চৈতা, বিরহা, ভজনমণ্ডলী, ছত্তিশগাড়ী গানের সম্পদ অসাধারণ কয়েকটি গান উল্লেখ করছি।

১। চৈতা গান (ভোজপুরী)

পিয়া পরদেশিয়া
দেওর ঘর লরিল হো রামা
কেকবাসে কহব দিলকে বাতিয়া।

২। হোলি গীত (উত্তর প্রদেশ)

কাঁহা যাতি হো জান
কাঁহা যাতি হো জান
নয়ে পহনে কা বন্দুড়িয়া (নববধূ)

পথচারী পুবড়ী একা একটি নববধূকে সকালে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করছে :

৩। ছত্তিশগড় লোকগীতি

পরোশিন বইঠ লেলেও
সুখ দুখকে গঠগঠিয়াই-এ লে লে
কাবাদলে কঁহো দিদি
শুনে না হিত রহে
কেউ সে জিন্দেগি কাটিতেলা
শুনে নাহি রহেন।

গৃহকর্ত্রী তার প্রতিবেশীকে দুঃখে অতিবাহিত দিনগুলির কথা বলছে। তার সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিচ্ছে। সংসারে সন্তান সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুণ আর্থিক দুর্দশা বাড়ছে বই কমছে না। বিরক্ত গৃহকর্ত্রী বলছেন, যদি বাজারে ছেলেগুলিকে বিকে দিতে পারতেন, তাহলে বেঁচে যেতেন।

এ থেকে বোঝা যায় লোককে যে গ্রামেই থাকতে হবে, তা ঠিক নয়। এ লোক গ্রামেও থাকতে পারে আবার শহরেও থাকতে পারে।

অনেকেই প্রশ্ন করতে দেখেছি, সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় লোক সংগীত কি রচিত হবে ?

এখানে কয়েকজনের মন্তব্যই প্রকাশ করবো।

বিখ্যাত লোক সংগীত গায়ক ও গবেষক প্রয়াত হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন "লোক

সংগীত শুধু অতীত-সন্ধানী নয়, লোক সংগীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিধ্বনি।" (লোক সংগীত সমীক্ষা—পৃ-১৬২)

সুপ্রসিদ্ধ গবেষক পন্ডিত লোকাচার্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৪ সালে একটি আমন্ত্রণ পেয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় বক্তৃতা দিতে যান রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; তার নাম 'সোভিয়েতে বঙ্গ সংস্কৃতি'। গ্রন্থটি জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত :সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়। এই গ্রন্থ থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি।

"সাধারণতঃ গ্রীষ্মের কয়েক মাস প্রতি বৎসর গবেষণা বিভাগের কর্মীরা লোকশ্রুতির উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য অভিযানে (folklore-expedition) বের হন। সেখান থেকে টেপ রেকর্ড যোগে গান, রূপকথা, উপকথা ছড়া, ধাঁধা এ সব সংগ্রহ করেন।"...

"এই বছর এই বিভাগ থেকে Folksongs of the last Patriotic war একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।"

"এই বিভাগের একজন প্রধান গবেষণা কর্মীর সঙ্গে সাম্প্রতিক লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা হল।"...

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দেশে যে ভাবে দ্রুত শিল্প ও বিজ্ঞানের বিস্তার হচ্ছে, তাতে লোক-সাহিত্যের ভাব, বিষয় এবং রূপ ইতিমধ্যেই কত দূর পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করেন? তিনি বলেন, একথা সত্য, এই অবস্থায় আমাদের দেশে অনেকে এমনও মনে করেন যে ভবিষ্যতে লোক-সাহিত্যের কোন অস্তিত্বই থাকবে না এবং তার লক্ষণও দেখা দিয়েছে; অবশ্য আর এক শ্রেণীর গবেষক আছেন, তাঁরা এ কথা মনে করেন না।

আমি বললাম, আমিও তা মনে করিনে। সমাজ যে ভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন, তার একটা সংহত রূপ থাকবেই এবং সেই অনুযায়ী লোক-সাহিত্যেরও পরিবর্তন হবে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, লোক-সাহিত্যের উপকরণ আপনারা আপনাদের দেশে এখন সমাজ-জীবনের কোনখান থেকে সংগ্রহ করেন, শ্রমিকদের মধ্য থেকে তার কি কিছু নিদর্শন পান?

তিনি বললেন, আমরা সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের মৎসজীবী পশুচারণকারী জাতি এদের মধ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করি। গ্রাম জীবনের মধ্যেও তার সন্ধান পাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, শ্রমিক জীবনের মধ্যে তার কি কোন অস্তিত্বের সন্ধান করতে পারেন ?

তিনি সে বিষয়ে কোন জবাব না দিয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, শ্রমিক জীবন সম্পর্কে আপনি জানতে চাইছেন কেন ?

আমি বললাম, আমাদের দেশেরই মত দ্রুত শিল্প জীবনের প্রসার হচ্ছে, কলকারখানা ও শ্রমিক মজুরের সংখ্যা বাড়ছে। আপনাদের দেশের অবস্থার কথা জানতে পারলে একই অবস্থায় আমাদের দেশেরও লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তার একটা আভাস পেতে পারি।

তিনি বলেলন, লোক-সাহিত্যের দিক থেকে এই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন।" (পৃ-১৫,১৬,১৭)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। এই উদ্ধৃতি থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকটি তথ্য,

১) Last patriotic war বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেই উল্লেখ করা হচ্ছে। সে সময় সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সেই war folksong রচিত এবং গীত হয়েছিল।

২) সোভিয়েত দেশে গ্রামের বিলুপ্তি হয় নি। মৎসজীবী পশুচারণকারী আছেন যাদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় লোক-সাহিত্যের নানা উপকরণ।

৩) সোভিয়েতে এক শ্রেণীর গবেষক আছেন যাঁরা মনে করেন না তাঁদের দেশে লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যতে কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

৪) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও মনে করেন না যে লোক-সাহিত্য অস্তিত্ব হারাবে।

৫) লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলছে, সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি।

চীনে কি ভিয়েতনামে লোক-সঙ্গীত তো রচিত হচ্ছে, তার উল্লেখ তো হেমাঙ্গবাবুই করেছেন তাঁর 'লোক-সঙ্গীত সমীক্ষা' গ্রন্থে।

ড. মযহারুল ইসলাম একজন প্রসিদ্ধ লোক-সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, তিনি তাঁর 'ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি' গ্রন্থে বলেছেন,

"ফোকলোর শুধু অতীতের, শুধু অনগ্রসর সমাজের, শুধু গ্রামাঞ্চলের, শুধু অশিক্ষিতের অথবা শুধু মৌখিক ঐতিহ্যের এ সমস্ত ধারণাও এখন বিলুপ্ত, ফোকলোরের প্রাঙ্গণ সুবিস্তৃত---অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, গ্রাম থেকে শহরে, অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিতের সমাজে, মৌখিক থেকে লিখিত ঐতিহ্যে।" (পৃঃ ১)

অতি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকায় বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন ক'রে লোক-সংগীত রচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত লোক-সংগীত গায়ক পিটু সিগার যা বলেছেন, তাই তুলে দিচ্ছি,

"At present the wave of Songwriting includes and extraordinary range of music tastes from art songs to rock and roll, from religious, to anti-religious, from the political Right to Left."

তিনি আরো বলেছেন:

"Some concentrate almost entirely on printing new songs on such subjects as the war on Vietnam, civil rights in Mississippi, and similar subjects." (Folk Music And Folklore—An Anthology—Vol. I—Published by Folk Music and Folklore Research Institute, Calcutta—P 141)

কৃষক বিদ্রোহ ও একগুচ্ছ লোক-সঙ্গীত

কডওয়েল বলেছেন, "Thus poetry combined with dance, ritual music becomes the great switch board of the instictive energy of the tribe, directing it into trains of collective reactions whose immediate causes or gratifications are not automatically decided by instict." (Illusion and Reality—P, 34)

এর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখি না। উৎপাদনের সংগে সংগীত নৃত্য এবং যাদুক্রিয়ার তৎকালে প্রয়োজন ছিল তা অস্বীকার কেউই করবেন না।

শুধু কি এই, যৌথ শ্রমের উৎসাহদাতা রূপেও লোক-সংগীত বা folklore এর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এ বিষয়ে গোর্কী বলেছেন,

"There was a time in antiquity when the toilers' oral lore was the sole organiser of their experience, the translator of ideas into terms of images and the stimulator of the collective labour energy, that is something we must realise—I will again draw your attention to the fact that most profound, striking and artistically perfect types of heroes have been created by folklore, the oral creation of the working people (Address in Writers Congress—1934)

কিন্তু দুঃখ এই, আমরা কয়জন সে গুরুত্ব দিই? এত' শুধু যারা folklore নিয়ে কাজ করেন সেই গুটিকয় বিশেষজ্ঞের বিষয় নয়, সকলের জানার বিষয়।

আমাদের দেশেও এমন অনেক উদাহরণ আছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে কর্ণ, ভীষ্ম, অভিমন্যু এগুলি ত আছেই; গুহক, চন্ডাল, গণেশ আরো বহু ট্রাইবাল চিফ্ (Tribal Chief) যাদের বীরত্বের কথা আমাদের সাহিত্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে, কিন্তু প্রায়ই দেখি কোনো না কোনো ধর্মোপদেশ দিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে এই সব বীরদের হত্যাই করা হয়েছে। যেমন মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণ ভীষ্মের সামনে শিখন্ডিকে দাঁড় করিয়ে হত্যা করানো হলো, কর্ণকে যুদ্ধের সমস্ত রীতি নিয়ম ভঙ্গ করে হত্যা করানো হলো, অভিমন্যুকে সপ্তরথী দিয়ে হত্যা করানো হলো। শম্বুক যেহেতু শূদ্র হয়ে বৈদিক যজ্ঞ করছিলেন এই অপরাধে রাম তাকে ব্রাহ্মণের নির্দেশে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। গীতায় ত শুধু হিংসারই জয় দেখতে পাই। অর্জুনকে হত্যা করার জন্য নানা যুক্তির জাল বিস্তার করে উত্তেজিত করতে কৃষ্ণ ছাড়েন নি অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে, কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধাই স্বর্গে স্থান পেল আর শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী পান্ডবদের নরক দর্শন করতে হলো। অথচ এই গীতাই মহাত্মা গান্ধীকে করে দিল অহিংস।

গীতার কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বা উচ্চবর্ণের স্বার্থই রক্ষিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ত চৈতন্য, যাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল বাংলার কৃষক সম্প্রদায়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই, শুধু এইটুকুই বলার যখন, "The prayer 'give us this day our daily bread' is substantial enough to the greater part of the world's population." ধর্মীয় বিশ্বাস পরবর্তী প্রস্তর যুগে আগে ছিল না, তখন খাদ্য বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ভাবনা ছিল না। (Myth and Reality. D. W Kosambi : Introduction)

নাট্য শাস্ত্রের প্রণেতা ভরত ও সামন্ত প্রভু (ইন্দ্র যার প্রতিনিধিত্ব করছেন) তারই স্বার্থে নাট্যশাস্ত্রে অসুর দৈত্য, যারা সত্যিকারের অসংখ্য জনগোষ্ঠী বা ট্রাইবাল গোষ্ঠীর ক্ষমতাশালী নেতা ছিলেন তাদের দেখানো হলো এমনভাবে যাতে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগে, ক্রোধ জাগে। সেই নাট্যশাস্ত্রে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে প্রথম নাটক পরিবেশিত হয়। বেদে যাদের অধিকার ছিল না তারা নাটক দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে এই ছিল উদ্দেশ্য। চারটি বেদ ও আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ (সংগীত) ও স্থাপত্য এই চারটি উপবেদ নিয়ে নাট্য শাস্ত্র

রচিত। (দ্রষ্টব্য-নাট্যশাস্ত্র: ভরত, ১ম খণ্ড ১৭-১৮ শ্লোক, অনুবাদক ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ছন্দা চক্রবর্তী)

যাই হোক, ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে দৈত্যরাও নাটক দেখতে এসেছিলেন। এই নাটকে ইন্দ্রের জয় এবং দৈত্যগণের পরাজয় প্রদর্শিত হলে, দৈত্যরা ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে নাটক আর হয় না। বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্র খুব ক্রোধান্বিত হন এবং জর্জর নামক ধ্বজা দিয়ে দৈতগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। তখন থেকে জর্জর হলো নাট্যানুষ্ঠান ও অভিনেতাদের রক্ষক। (শ্লোক ৬৪-৭০-ঐ পৃ ১১)

কিন্তু দৈত্যগণকে চটিয়ে কাজ হবেনা। শ্রেণী-সমন্বয়ের প্রয়োজন, তাই ব্রহ্মার নির্দেশে দ্বিতীয় নাটক হয় সমুদ্র মন্থন এতে দৈত্যরাও অংশ নিতে পারবেন।

এগুলি বলার এই কারণ যবে থেকে ধর্ম চতুবর্ণ সৃষ্টি হলো, সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলো তখন থেকেই যাঁরা উৎপাদনের সংগে যুক্ত তারা হতে থাকলো অত্যাচারিত, ইতিহাসে অনুল্লেখিত। তাই বলে তারা যে এই অত্যাচার, ঘৃণা অপমান নীরবে সহ্য করেছে তা ভাবারও কারণ নেই। শ্রেণী সংঘাত থেমে থাকে নি। এই সব শ্রেণী সংঘাতের সংগে সংগে যে লোক সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল—সে-সব সংগীত ছিল নিশ্চয়ই জীবনধর্ম্মী। হয়ত ভবিষ্যতের আশাও থাকত, থাকত অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা।

এই সংগীতগুলির উপর ভিত্তি করেই মার্গ সংগীতের সৃষ্টি; তার রাগ রাগিণীর মধ্যে এখনো তা বেঁচে আছে—যথা আভীর জাতির সুর নিয়ে হলো আহিরী, মালবজাতীর সুর নিয়ে মালকোষ ইত্যাদি। কখনো ট্রাইবাল স্বরের সংগে একটি স্বর বাড়িয়ে দিয়ে রাগ সংগীত করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য লোক সংগীত সমীক্ষা—হেমাঙ্গ বিশ্বাস)।

লোক কথা বা লোক সংগীত শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের উৎস থেকেই উঠে এসেছে। 'লোক' বলতে, যাদের চিহ্নিত করা হয়, তাঁরা সমাজ-ভুক্তও নন আবার শিষ্ট অভিজাত শ্রেণীভুক্ত নন। অবশ্য এখন দেখা যাচ্ছে এই 'লোক'দের থেকেই কালের গতি ধারায় অনেক অভিজাত শ্রেণীতে উঠে এসেছেন, এবং অনেকেই উপবীত ধারণ ক'রে উচ্চ বর্ণে স্থান ক'রে নিচ্ছেন এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও নিয়েছেন। এর মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ বা সামন্তদের অত্যাচার। একনাথ বহু মারাঠী কবিতার স্রষ্টা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ইনি অবশ্য ছিলেন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আবার এই শতাব্দীতেই তুকারাম, যিনি নিজে ছিলেন কৃষক। ব্রাহ্মণদের ঘৃণা সহ্য করতে না পেরে জলে ডুবে

আত্মহত্যা করেন। এই পরিণতির কারণ, তাঁরা যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের খুশি করতে পারেন নি। "The real mililary srtrength of the Marathas derived obviously from the simpler, less caste-ridden, and less unequal life. The later Maratha generals like Sinde and Gaekwad rose from relatively obscure families, unlike the earlier and more distsnguished Canrarao More, Bhonsle, and Jadhav, the last of whom might claim kinship with the Jadhav emperors of Debgiri, and through them perphaps with Krisna himself আবার Malharrao Holkar was of the Dhangar shepherd caste, and would normally nat have been allowed to the status of general, duke and eventually king.,' (Myth and Reality by D. D. Kosambi—P 34) কিন্তু এই জাতিগত অস্পৃশ্যতা নিয়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত আন্দোলন হয় নি।

এটি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে 'লোক' নানান সুযোগ সুবিধা এবং শাসক শ্রেণীর কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হলে উচ্চ শ্রেণীতেও উঠতে পারে।

যাই হোক, 'লোক' বলতে তাদেরই বলা হয় যারা আদিম সমাজ ভুক্ত নন বা শিষ্ট শ্রেণীভুক্তও নন। এই দুই স্তরের মধ্যবর্তীস্তরে অবস্থান করেন। এখানে জাতির বা পেশার কোনো প্রশ্ন নেই।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, folklore-এর সঙ্গে শ্রেণী দ্বন্দ্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অনেকে কিছু দিন পূর্বেও বলতেন, ও সব নীচু জাতির গান, কেউ কেউ আবার বলতেন, আরে মশাই, সন্ধ্যা বেলায় সব মদ খেয়ে এসে চেঁচায় হুল্লোড় করে। এ সব কি আর গান? লোক শিল্পীদের প্রতি ঘৃণা থেকেই এই সব মন্তব্য করা হতো। শোনবার মন যদি থাকত, তবে শুনতে পেতেন তাদের প্রাণের কথা, বেদনার কথা, আবার শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথাও।

কোনো জোতদারের স্ত্রির যদি মেদ থাকে, এবং তা যদি দৈবাৎ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার বা তার পুত্রের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না; যদি একটি বাউরী ঝুমুর গানে বলে,

ও পাকা ডিঙালা রে,
ডিঙালার ভিতর ফরা
গেল ছুঁড়ির ডবল চেহারা!

(ডিঙালা=কুমড়ো)

কিংবা যদি গায়—

বাউরী করেছে ভগবান হে
বাউরী করেছে ভগবান।
আমি যদি বামুন হতম
মাঝ কুলিতে দালান দিতম⋯ ইত্যাদি।

উচ্চ শ্রেণীর গায়ে লাগার কথাই। যেহেতু বাউরী সমাজে অস্পৃশ্য অতএব তাকে উচ্চবর্ণের সংস্রব থেকে দূরে থাকতেই হবে।

শাসক বর্গেরও ভালোলাগার কথা নয়, যদি গরীব মানুষ মুড়ি বিক্রি ক'রে সংসার চালার চালায়, সেই গান শোনার পর, সে যদি গায়—

দামু পারে
সংসার চালাই মুড়ি বিকে বাজারে।
সর্বনাশা আইন হলো গো মুড়ি বন্ধ একেবারে
জল কলেতে কাজ করিতে মুড়ি লিলে তাও ধরে,
হোমগার্ডরা নদীর ধারে গো, বসে আজ তাক করে
ধরলে পড়ে ছাড়বেক নাইকো গো, নিয়ে যাবে শ্রীঘরে।
ছোট ছোট ছিলাপুলা গো, কি খাওয়াব সবারে
মুড়ি বিকা বন্ধ হলে পরাণে যে যাই ম্যরে। ইত্যাদি'

এ গুলি শুধু গান নয়, গরীব অসহায় মানুষের প্রতিবাদও। এরা শোষিত শ্রেণীভুক্ত।

Y. M. Sokolov তাঁর Russian Folklore (U. S. A-1950) এ বলেছেন, "Folklore has been, and continues to be, a reflection and a weapon of class couflict ; Consequently, again, it is not distinguished in nature, in any way from artistic literature, with reference also to its social function as a reflection and weapon of class conflict."

এই উক্তি যে কত সত্য তা পরে আমরা দেখবো। লোক জীবন বৃত্তের folklore-এর স্থান, আবার folklore-এর সমৃদ্ধতম অংশ লোকসঙ্গীত। লোক সঙ্গীত লোক কথা, রূপকথাগুলিকে যদি সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচয় মেলে এবং এগুলিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্ত্রের প্রতিফলন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, তার 'লোক কাহিনী ও চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮৭ সালের দৈনিক বসুমতীর শারদ সংখ্যায়। কিন্তু আমাদের

হয়ত এটা দুর্ভাগ্যই যে অনেক গবেষক এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে গ্রহণ ক'রে গবেষণা করেন না, যত করেন নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি দিক নিয়ে। এটি আবিষ্কার করতে না পারলে Tradition কি রক্ষা করা হবে? কিন্তু গবেষকরা যাই করুন শোষিত মানুষ অনাচার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান রচনা করছে গাইছে, এবং তার জন্য গোঁড়া সংকীর্ণচেতা মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এইত কিছু দিন পূর্বেই, মুর্শিদাবাদের মুসলিম মহিলা শিল্পীদের পরিবারের উপর আক্রমণ হয়ে গেলো, প্রকাশ্যে বিয়ের গান পরিবেশনার অপরাধে, বাউলদের উপরও এমনি আক্রমণ হয়। তবু এই অত্যাচারিত শিল্পীরা পিছিয়ে যান নি, বরং আরো সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে আসছেন।

আমাদের সংগ্রহে বহু অতীতের গান নেই, যেগুলি আছে সেইগুলি অবলম্বন করেই দেখাবার চেস্টা করবো শাসকের প্রয়োজনে যুদ্ধ এবং তাদের লুন্ঠন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তারই সাথে, সংগীত ছড়া ইত্যাদি রচনা করেছিলেন, সেগুলি যেমন তাঁদের তেমনি আজো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। গোঁড়া লোক সংগীত গবেষকরা হয়ত এতে রাজনীতির গন্ধ পাবেন, তা পান ক্ষতি নেই, কিন্তু এগুলি আমাদের মূল্যবান tradition. এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন, ধর্মীয় আন্দোলন যেগুলি অতীতে হয়েছিল তা ধর্মের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে পরিণতিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বরূপে উত্তরিত হয়েছিল। 'গারো বিদ্রোহ' 'পাগলপন্থী বিদ্রোহ' তিতুমীর পরিচালিত 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' এবং 'ফারাজী বিদ্রোহ' শুরুতে ধর্ম-ভিত্তিক হলেও ক্রমশই জমিদার তালুকদার মহাজনদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্রোহীরা, মধ্য যুগেও দেখি হিন্দু ধর্মের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, রামানন্দ, কবীর তুকারাম শঙ্করদেবদের ভক্তি ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম আসাম থেকে উত্তর ভারত ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত কৃষক বিদ্রোহের জোয়ার এনেছিল।

মুঘল আমলেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে অসংখ্য বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বাদশাহী সৈনাদের। সে সময় যে লোক সংগীত রচিত হয়নি তা কে বলবে; এর ত আর কোনো লিখিতরূপ লভ্য নয়, তবে অনুমিত হয় নিশ্চয় হয়েছিল। মুঘল আমলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এইত উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে কত লোক সংগীত রচিত হয়েছিল, তার কত কটি লভ্য?

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি বিদ্রোহ হয়েছে তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে, যথা চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, মেদিনীপুর

রংপুর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ময়মনসিং বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, সন্দীপের প্রজা বিদ্রোহ ইত্যাদি। এই বিদ্রোহ-গুলিকে অবলম্বন করে যে অসংখ্য গান ছড়া লোক কথার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সহজলভ্য নয়, যেগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেইগুলি থেকে নিয়ে তাই সংকলিত করছি।

কোম্পানীর পূর্বে সমাজ বিকাশের একটি স্বাধীন ধারা প্রবাহিত ছিল, এই ধারা বাধাপ্রাপ্ত হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
শাসনের পর, মূলত বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর। এই পরাজয় বাংলার মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল, এঁরা চান নি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে। বাঙালীর মর্মবেদনা রূপ পেয়েছিল তাদের লোক সংগীতেও।

কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে হারালো পরান।
নবাব কাঁদে, সিপুই কাদে, আর কাঁদে হাতী
কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটি।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে, মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।

কোম্পানির আমলের শুরু থেকেই অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে—শুধু বাংলায় নয়, পরবর্তী সময়ে সারা ভারতবর্ষেই, যেহেতু কোম্পানী প্রথমে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কারণে, তাদের স্বার্থে শোষণের মাত্রাও হয় বল্গাহীন। শোষণের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই কৃষকদের অন্তরে

পুঞ্জীভূত হতে থাকে ক্ষোভ, ক্রমে এক দিন এই ক্ষোভই বিদ্রোহ আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

কোম্পানি শাসনের প্রথম বিদ্রোহ পশ্চিম ভারতে ব্রোচ্ ও বরোদার তাঁতীদের বিদ্রোহ। মিউটিনি বা স্ট্রাইকের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

শান্তিপুরের তাঁতীরা যখন নিদারুণ অত্যাচারের শিকার হয় তখন তারা শপথ নেয় কোম্পানির জন্য কাজ তারা করবে না।

এমনি বিদ্রোহ করেছিল মেদিনীপুরের মালঙ্গীরাও। তারা লবণ তৈরী করত। কোম্পানী তাদের কাছে কম মূল্যে লবণ কিনে নিত। মালঙ্গীরা কোম্পানী নির্ধারিত মূল্য দিত অস্বীকার করে আবেদন নিবেদন করে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। কোম্পানীর লোক তাদের কাছ থেকে লবন ছিনিয়ে নেয়। এই বিষয়ে বিচার প্রার্থী হয়ে, আবার তারা আবেদন করে। কোনো রাস্তা না দেখে পরমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এই দুটি বিদ্রোহের সময় যে লোক সংগীত রচিত হয়েছিল, তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

১৭৮৪ সালে দিনাজপুরে দেবী সিং-এর বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। দিনাজপুরের রাজা মারা যাবার পর কোম্পানি দেবী সিং নামে এক ব্যক্তিকে নাবালকের সম্পত্তি দেখা শোনার জন্য নিযুক্ত করে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেবী সিং ১৭৮১ সালে সেটেলমেন্টের সময় রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বেনামীতে গ্রহণ করে কোম্পানির আদায়কারী বা ইজারাদার নিযুক্ত হন। দেবী সিং নিজে কিছু কিছু ট্যাক্সও ধার্য করেন। এই ট্যাক্সের জন্য কৃষকদের জমি অলংকার এমন কি নিজেদের ছেলে মেয়েদেরও বিক্রী করে ট্যাক্স দিতে হয়। তাতেও রেহাই ছিল না। কোর্টে আবেদন নিবেদন। তাও বিফল হয়। কোনো সুরাহা না-হওয়ায় পরিশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় চাষীরা। বিদ্রোহ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা কয়েকজন শত্রুকে হত্যা করে ঘোষণা করে তারা খাজনা দেবে না। রংপুরের প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে দিনাজপুর ও কোচবিহারে। বিদ্রোহীরা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তাদের প্রধান নেতা ধীরাজ নারায়ণকে নবাব রূপে নির্বাচিত করে।

এই সময়ে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে প্রজা বিদ্রোহ ঘটে। এ বিষয়ে হান্টার সাহেবের গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই বিদ্রোহে বিষ্ণুপুরের রাজাও যোগদান করেন। এই বিদ্রোহ বীরভূম পর্যন্ত বিস্তার করে। হান্টারের হিসেব মত, এই বিদ্রোহে দু মাসে কোম্পানির ক্ষতি হয় ৬৬৬,৬৬ : ১০ : ১০ : সিক্কা।

এই বিদ্রোহগুলির লোক সঙ্গীত দুর্লভ।

এর পরে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহ।

চুয়াড়রা বাস করত জঙ্গলে। কৃষিকর্মই ছিল জীবিকা। এরা পাইকান জমি চাষ করত। এ জমি ছিল মেদিনীপুরের রাণীর দান। পাইকান শব্দ থেকে অনুমিত হয়, এরা রাণীর পাইকের কাজ করত। কোম্পানী এ জমি কেড়ে নেয় এবং জমির খাজনাও চড়া হারে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহে জমিদাররা কৃষক ও পাইকরা যোগদান করে। এই বিদ্রোহ বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য কোম্পানিকে সৈন্য প্রেরণ করতে হয়েছিল। এই বিদ্রোহ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া হতে বীরভূম বিস্তৃত লাভ করে। বিদ্রোহের কাল ১৭৯৮-৯৯।

বিদ্রোহকে অবলম্বন করে বহু লোক-সঙ্গীত রচিত হয়, তাদের কয়েকটি উল্লেখিত হলো।

১। হাঁসা রাজার কাঁসা সিং
চড়া হল বিষম সিং (২)
ওগো মলভুঁয়ে(৩) লাগল লড়হাই
মলভুঁয়ে মরে গেল রাজা হো বিষণ সিং
পাগড়ী আইলো রে নিশান।
কাহা ছুটলো ম'র হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
কাহা ছুট লো ম'র ঢাল তলোয়ার

২। চড়েং লাগল ঘোড়া,
চমরে লাগল জিন।
রাজা আইবে রণ,
হাঁসা রাজার ঘোড়া।
বিষণ সিং মলভুঁয়ে সাজলো লড়াই।
কাঁথ ভিজল হাঁসা রাজার ঘোড়া
কাঁথ ভিজল ঢাল তলোয়ার।
তার সে ভিজল রণে হাঁসা রাজার ঘোড়া হো
রক্তে ভিজল ঢাল তলোয়ার।
কান্দে লাগল খৈয়রো রাণী
নইনে বহে লড়
সিথাকে সিঁদুর রাণী দেবে হরিলেন।

৩। কাহা মলিন বাজে
জোড়ারে ধমসা
কাহা মলিন বাজে করতাল।
আখরা রাহি বাজে
জোডা-রে ধমসা চল যাব আমরা রণে।

চুয়াড বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে ১৭৬০ সালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়। ১৭৬০ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে। এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর বঙ্গ। বিদ্রোহের কারণ – ইংরেজদের অত্যাচার। এইরূপে কথিত আছে. যে সন্ন্যাসীদের হাঙ্গামার জন্যই এবং বর্গীদের হাঙ্গামার জন্য খাজনা আদায় হচ্ছিল না ; অতএব হাঙ্গামাকারীদের দমন করাই প্রাথমিক কর্তব্য। যদিও ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলা হয়েছে, তবু এতে মুসলমান ফকিরেরাও যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উক্ত বিদ্রোহে নেতৃত্বের একটি ভাল অংশ মুসলমান ছিলেন। বিদ্রোহ ঢাকা রংপুর,, বর্ধমান কৃষ্ণনগর. রাজসাহী পর্যন্ত বিস্তার করেছিল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রথম ওয়াহাবি আন্দোলনের শুরু। তিতুমীর গ্রন্থ প্রণেতা বিহারীলাল সরকার বলছেন,

"তিতু উদ্যোগী শক্তিশালী পুরুষ। যে-সকল মুসলমান তিতুর মতাবলম্বী ছিল না, তিতু তাহাদিগকে আপনার মতাবলম্বী করিবার জন্য প্রাণান্ত পণ করিল। নিজ গ্রামে এবং নিকটবর্তী গ্রামে নব সংস্কৃত ওয়াহাবী ধর্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। তিতুর ধর্মমতে অনেক মুসলমানও প্রীত নহে। তিতুর মতে পয়-পয়গম্বর মানিতে নাই, মন্দির মসজিদ তৈয়ারী করিতে নাই, শ্রাদ্ধ শান্তির (মুসলমানী কথা 'ফয়তা') প্রয়োজন নাই, টাকা কর্জ দিয়া সুদ লইতে নাই। তিতু প্রচার করিল, পর্বোপলক্ষে বা পুত্র কন্যার বিবাহে বাদ্যোদম করিবে না, কাছা দিয়ে কাপড় পরিবে না।"

তিতুর এই প্রচারে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানরা তিতুর দলে ছিল। ক্রমেই তিতুমীরের আন্দোলন জমিদার নীল-করদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তিতু একটি বাঁশের কেল্লা তৈরী ক'রে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

তিতুর এই সংগ্রামকে ভিত্তি ক'রে বহু গানই রচিত হয়েছে, এদের মধ্যে যে ক'টির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলির উল্লেখ করছি। গানগুলির মধ্যে কিছু আছে শ্লেষাত্মক। বিহারী লাল সরকার তাঁর উক্ত গ্রন্থে

বলেছেন, তিতুর মৃত্যুর ষাট বছর পরেও ভিখারীরা এ-সব গান গেয়ে বেড়াতেন।

১। উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারকেল বেড়ে,
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়া ওরে বুড়ী আজকে গাঁয়েষ হাট
কাস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥
তিতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা
তাতে আমার নাই হেল্লা,
যেমন মাঠ ছিল তেমনি হল মাঠ,
কাস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

২। নারকেলবেড়ে গাঁয়েতে এক জন ছিল তিতুমীর,
লরা সারিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির
পীর পয়গম্বর কতুব আলি কিছুই তিনি মানবেন না;
এবার মারলে ইংরাঁজের মামু জানে নাকলে না।
সবাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যায়, একি হল দায়॥
বিহারী লাল সরকারের এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন স্বপন বসু।
এবার মাল্লেগুলি, ভাঙলে খুলি, হজরৎ গুলি খেলে না,
এবার মারলে ইংরাজের মামু জানে রাখলে না॥
সদার বলে আল্লা-নবি, আমার হল কি,
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ-ঝি।
তার প্রতিফল হাতে হাতে জারি জুরি খাটল না।
এবার মারলে ইংরাজের মামু জানে নাকলে না॥

৩। জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজার বাড়ী গিয়ে জোলা গোঁপ দাড়ি কাট॥
তিতুমরীরের গলা ধরে নসরুদ্দিন কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়॥
এসেছে রাঙা গোলা উর্দি পরা ব্যাতের টোপ মাথায়
এরা মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হজরৎ গুলি মানলে না।
মারলে ইংরাজের মামু, এবার আর জানে রাখলে না।

১। সাদা, ২। পাঠান্তরে অচল সিং ৩। মলভূঁয় (মল্লভূম বিষ্ণুপুর) এই গানগুলি চিত্ত মন্ডল সংকলিত। সিসৃক্ষা মাসিক পত্রের ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শুন সব ভক্তি ভাবে করি নিবেদন।
হজরৎ আলির লড়াই-এর শোনো বিবরণ ॥
কৃষ্টদেব রায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল ন্যাড়া।
ফকিরের বুজরুকিতে লোক হল পুঁড়া ছাড়া ॥
নাই আর অন্য গতি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার
ব্রহ্ম হত্যা গোবধ আদি কল্ল একাকার ॥
কয়েকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মৌলবি সব হল।
মুলুকগিরি করি ফিরি লাউঘাটিতে গেল ॥
সেখানে করলে মজা, তুললে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্ত রায়ের ব্যাটা দেবনাথকে মারে ॥
কইতে ফাটে বুক, বড় দুঃখ, রায় মরে গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥
কিন্তু যত ন্যাড়া গণের ঘোড়া কেড়ে গিয়ে লয়।
ঘোড়া জোড়া ফেলে ন্যাড়া পলাইয়ে যায় ॥
এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, যত ন্যাড়া মেলে।
গেরস্থ লোক পালায় সব ঘর দুয়ার ফেলে ॥
তাদের বা দুঃখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়।
দেখলে ন্যাড়া, দায় তাড়া, বুদ্ধি হনা হয় ॥
এই রূপ লোটে দেশ, অবশেষ, নারকেল বেড়ে গিয়ে।
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাঁশের বেড়া দিয়ে ॥
তিতুমীর বাদশা হল, হুকুম দিল, উজিরের তরে।
মৈজদ্দি উজির হয়ে হুকুম জারি করে ॥
ফৌজ সব ফেরে কত, দেড়ে যত, ইট লাঠি লয়ে।
পাগলের কথা কাজ কিরে ভাই কয়ে ॥
শেষেতে একে আর, বাঁচা ভার, শুন সমাচার।
বার ঘরের কুঠি লুঠে কল্লে ছারখার ॥
সাহেব যায় পালাইয়ে খবর নিয়ে, মেজেস্টারে গিয়ে।
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইলো ফৌজ নিয়ে ॥
যত সব চৌকিদার, সমাচার, মেজেস্টারে পেয়ে।
মৌলবিদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে ॥

কিন্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অস্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল।
মার মার শব্দ করে মৌলবি সব গেল ॥
মাল্লে সেপাই যত, কব কত, আহা মরি মরি।
দারোগাকে মাল্লে সব চারিদিকে ঘেরি ॥
সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে রে পালাল।
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বুদ্ধি বেড়ে গেল ॥
মিশাতে পর্ব্বত নাড়ে, ফিরে রায়ে, বন্দে চমৎকার
নদে জেলার, ম্যাজিস্টর, আইল তারপর ॥
কিন্তু তার জাঁক দড়, হয়ে দড় আদু সাহেব এল।
সুলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল ॥
ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে, মিছে কিন্তু নয়।
একদিন চাউনি ক'রে বার, ঘরেতে রয় ॥
পর দিন কামান ছোটে, সাহেব ওঠে, দেলপুর হয়ে।
দেলপুরের ম্যাজিস্টার আইল ফৌজি লয়ে ॥
এইটে ভেবে মনে, ডেবিসনে, এদের সাহেব বলে ॥
বারাসতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে ॥
দেখিগে নারকেল বেড়ে, কোতা লড়াই দ্যায়।
বুকে পিঠে মারব গোলা বাঁচবে কে কোথায় ॥
ডেবিসন 'ইএস' বলিল, সব হুইল, হাতির উপর চড়ে।
মার মার শব্দ করে চল্ল নারকেল বেড়ে ॥
হাতি যায় দশ বারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আট জন ইংরাজ।
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ ॥
দারগা সবিভারে, একত্রে যাচ্ছে মহিমদিতে।
হাতির আগে সুবল গোলক চল্ল লাঠি হাতে ॥
বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ন করে, দিল সাহেবেতে।
দেখতে পেয়ে এলো ধেয়ে যতেক হেদোতে ॥
তলোয়ার লাঠি হাতে, বন্দুক সাতে, লয়ে কতকগুলো।
সাহেবকে তাড়ায়ে চল্লো কাছা খোলা ॥
সুবল গোলককে বলে, কাজকি হেথা থেকে।
মাথার পাতা ফেলে এখন পার হও পাটনি ডেকে ॥
সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বন্দুক নিল হাতে।
কাট কাট বলে গেল বজরার নিকটে ॥

বলে ফকির কোথায় উজীর
হুকুম জারি করে।
শুনে উজীর, হল হাজির
ফকিরের হুজুরে ॥
হুকুম দ্যায় কারে ভয়
লড়ায়েতে সাজে।
দিয়ে সায়, উজীর যায়
হেদান্যের মাঝে ॥
করে ধুম বড় জুম
মৌলবি সব সাতে।
কেউ ঢাল তলওয়ার
পিস্তল লয়ে হাতে ॥
ধায় নেড়ে কালা পেড়ে
বলে আয় ধীরে।
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
ইট ফেলে মারে ॥
ইংগ বেসে তবে সাজে
হুকুম দিল কাপটেনে।
হুকুম পেয়ে সেপাই বেয়ে
যায় কেল্লা পানে ॥
তোপ ছাড়ে দেড়ে পরে
মরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঘোর শব্দ শুনি তব্ধ
আল্লা বলে ডাকে ॥
কোন দেড়ে যায় দৌড়ে
তরুক্ সাত্তারে কাটে।
কোটা ফাটে ধুম ওটে
বোমের গোল্লা ছোটে ॥
কব কত সমীন যত
পালায়ে যায় ঘরে।
হরু কয় মিথ্যা নয়
গেলা ছারে খারে।

হয়ন্ নামক কোনো ব্যক্তি ছড়াটি লিখেছেন। ছড়ায় যে শব্দ 'নেড়ে' ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো মতেই সুরুচির পরিচায়ক নয়, এ ছাড়া তিতুমীরের ঐ সংগ্রামকে খানিকটা বিদ্রুপ করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তিতুমিরের সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে একাধিক কবিতা ও ছড়া লেখা হয়েছে।

বাংলার নীল চাষীদের আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে শুরু হয় ১৭৭৮ সালে চলে ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু হয়, ১৮৩০ সালে চলে ১৮৪৮ পর্যন্ত।

এই নীল চাষ ও নীলকর দাতাদের মনোভাব ও নীলকর সাহেবদের মনোভাব আর অত্যাচার বিষয়ে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে অধ্যাপক হারাণ চন্দ্র চাকলাদার তাঁর Dawn Magazine, July 1905 এ লিখেছেন :—

"The woes of a class of Bengal Peasantry under European Indigos planters ; যার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল :-

> "আঠারো শতকের শেষভাগে ভারতে নীল চাষ বিস্তারের সময় য়ুরোপীয়রা এদেশে আসিয়াছিল দাস মালিকদের মনোবৃত্তি লইয়া। নিরংকুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রচন্ড লোভের সংগে উদভাবনী কল্পনা শক্তি মিলিত হইয়া যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবগণ এদেশে প্রয়োগ করিয়াছিল বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই অকাট্য প্রমাণ যে, নীল চাষ প্রবর্তনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা একেবারে না উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্হায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হইত, তাহার মধ্যে ছিল হত্যাকান্ড, বিচ্ছিন্ন ভাবে খুন ব্যাপক ভাবে খুন আর দাংগা, লুটতরাজ, গৃহদাহ, লোক অপহরণ।"

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস", তার আর এক প্রমাণ। নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামে বিশ্বনাথ সর্দারের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন জাতিতে বাগ্দী। নীলচাষীদের আন্দোলনের দুর্ধর্ষ নেতা। এঁকে ইংরাজরা বলত বিশে ডাকাত বলে। ইতিহাসে ইনি বিশু ডাকাত নামেই পরিচিত। এই বিশ্বনাথকে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেওয়া হয়। এঁকে নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছিল। এখন সে-সব গান পাওয়া যায় না। বিশ্বনাথ ছাড়াও আরো দু-জন নেতার নাম পাওয়া যায়। এক জনের নাম বিষ্ণু চরণ বিশ্বাস, অপর জনের নাম দিগম্বর বিশ্বাস। নদীয়ার বিস্তৃত পল্লীতে হয়ত এখনো চেষ্টা করলে বিশ্বনাথকে নিয়ে রচিত গান কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে।

পাদরি লং বহু গান সংগ্রহ ক'রে একটি পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এ-বইটি হয়ত সাহিত্য পরিষদ কিম্বা জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

এবার গানগুলি দিই :

১। জাত মাল্লে পাদ্রী ধরে
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে
বেড়াল চোখো হাঁদা হেঁসদো
নীল কুঠির নীল মেমদো।

কলকাতার বাবুরা মাঝে মাঝে বজরায় চেপে লড়াই দেখতে যেতেন। নীল চাষী ও সাধারণ মানুষ একে সুনজরে দেখতেন না।

২। মোল্লা হাটির লম্বা লাঠি
রইল সব হুদোর আঁটি
কলকাতার বাবু ধেয়ে
এলো সব বজরা বেয়ে—
লড়াই দেখবে বলে।

হিন্দু প্যাট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে তাঁর কাগজে লিখতেন। বিদ্রোহীদের সাহায্য ও সমর্থন করতেন। এই অপরাধে লং সাহেবের কারাবাস হয়। হরিশচন্দ্র মারা যান। চাষীরা গেয়েছিল,

৩। নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কর্ল এবার ছাড়খার
অসময়ে হরিশ মলো
লং এর হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার।

লং সাহেবের পুস্তিকাটির উল্লেখ আগেই করেছি। সেই পুস্তিকা থেকেই একটি গানের বিষয়বস্তু তুলে দিয়েছেন সুপ্রকাশ রায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে। গানের বিষয় এই :—

৪। "নীলের চাষের জন্য চাষীকে নীলকরের আগাম দেওয়া টাকার সুদ দিতে হয় তিন পুরুষ ধরিয়া। নীলকর সাহেব যখন প্রথম আসে তখন থাকে ভিখারীর মত। অবশেষে তাহারই দাপটে রায়তের হাড়ে দূর্বা গজায়। নীলকর সাহেব সুঁচ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বাহির হয়। তাহারা পঙ্গপালের মত দেশের ক্ষেত খামার উৎসন্ন দিয়াছে। প্রজাদের সর্বনাশ হইতেছে, রাজার সে-দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। যখন যাইতে বসিয়াছে তখন আর আমরা ভগবান ভিন্ন কাকে জানাইব ?

রাত্রিতে যখন চক্ষু বন্ধ করি, তখনো নীলকরদের সাদা সাদা মুখগুলি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়। ভয়ে আমাদের প্রাণ পাখীর মত উড়িয়া যায়। যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।"

১৮৪০ সালে রেণী নামে একজন সৈনিক স্ত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হিসাবে খুলনার হোগলা পরগণার চারি আনা অংশের মালিক হয়ে খুলনায় আসেন পরে সরকারের নিকট থেকে রূপসা চর এবং ইলাইপুর তালুক পত্তনি নেন জমিদারদের কাছ থেকে। ইনি নীল ও চিনির দশ বারোটি কুঠি খুলেছিলেন! বলাই বাহুল্য তাঁর অত্যাচারে ও অবিচারে কৃষকরা অস্থির হয়ে ওঠে।

রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এই বিদ্রোহে জমিদার তালুকদাররাও যোগ দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিবনাথ ঘোষ নামক এক তালুকদার। এঁকে নিয়ে গান রচিত হয়েছিল। সাদেক মোল্লাও একজন নেতা।

৫। গুলিগোলা সাদেক মোল্লা
রেণীর দর্প করলে চুর
বাজিল শিবনাথের ডংকা
ধন্য বাংলা বাঙালী বীর।

ছড়া

৬। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা
একবার লাগলে আর ওঠে না।

৭। জমির শত্রু নীল, কাকের শত্রু চিল
আর জাতির শত্রু পাদ্রী হিল।

৮। জমিনের শত্রু নীল
কর্মের শত্রু চিল
(এমনি) জাতের শত্রু পাদরী হিল।

৯। দেখিয়া শিবের ভংগী
পলাইল দীনেই সংগী।*

বাউল সুর

১০। এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে
ব্রহ্মাস্ত্র বল করে নিলে।

*শিব—শিবনাথ ঘোষ, দীন—রেণীর দেওয়ান

নীলের জ্বালায় যাব কোথায়
নীলে সব ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে নিলে।
নীলের অনুষঙ্গী যারা
শমনের দূত যেমন তারা
পায় যারে তারে করে সারা
ডুবায় মারে বেন্দে হাতে গলে।
প্রথম নীল বিজন বেশে
প্রবেশিল সর্বদেশে
এই করলে সর্বনেশে
সকলকে মজালে ।।
আড়াই সের ওজনে নীলে
ক বিঘায় ছিটিয়ে পড়ে জন্ম নিলে।
নীলমণির দাদনের কালে
দেওয়ানজী তার অর্ধেক নিলে।
ছোট চাষ নিড়ানি বিদে
দিতে সবাই নাকে কাঁদে
না দিলে সারে বেঁধে
এই করে শেষ কালে।
এবার নীলমণির কাছে
মান গেছে, অপমান আছে
একথা নয়-গো মিছে
জানাব কি বলে
উত্তম অধমে সমান হয়েছে
বিচার কলিকালে।।

১১। বজরা চলে এলো মেলো
ডিঙা চলে সাথে
দেবী সাহেবের নীল ঘোড়া
চলে ডাঙা পথে।

১২। ভাসছে মন মনের হরিষে
(আগে) লুঠে খেত এক হরিশে
(এখন) বাঁচালে এক হরিশে

বুনে বুনে নীল কত জমির খিল
(এখন) হতেছে তায়, অড়র কলাই সরিষে।

১৩। নীল দর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে ॥
কারো করতে উপকার তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার হরিশ লিখে মরেছে।
ঈডা, গ্রাণ্ট মহামতি ন্যায়বান উভয়ে অতি
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে।
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পড়ে, কে না অন্তরে পোড়ে
তবু নীলিরা নড়ে চড়ে পোড়ার দেখাতেছে।
বলতে দুখে বুক বিদরে ওয়েলেস্ অবিচার করে
নির্দোষী লংকে ধরে একটি মাস ম্যাক দিয়েছে ॥
ওয়েলস্, পিকক, জ্যাকসনে, বসি বিচারাসনে
*** হাজার টাকা ফাইন করেছে।
নিদারুণ সেনটেন্স শুনে, সিংহ বাবু দয়া গুনে
হাজার টাকা দিলেন গুনে, ওয়াস্টার গ্রেট তাই তাই হয়েছে।
ইংলন্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ
আইনে যে সুনিপুণ এবার বেরিয়ে পড়েছে।
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা হেট্রিড খুব রেগেছে ॥
বেঞ্চে বাতুলের মত, লম্ফ-ঝম্ফ করে কত
আবার বলে আমার মত, কেবা জজ্ হেথা এসেছে ॥
কিন্তু পীল সিটন্ আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি
তাদের লাগি আজ ও কাঁদি, হায় কি বিচার করে গেছে ॥
মহারাণী তোমার প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি
ওয়েলেস্ পাপে দেও মুকতি ধীরাজ এই বলিতেছে ॥*

১২। হে নিরদয় নীলকরগণ
আর সহেনা প্রাণে এ নীলদহন ॥
কৃষকের ধনে প্রাণে দহিল নীল আগুনে

*** এই জায়গায় হয়ত মাইকেল হবে, সিংহ মশায়—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

* আমার মনে হয় এটি যথার্থ লোক সঙ্গীত নয়। 'কবি' হতে পারে।

গুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে
লুঠেছে সকল তো হে, কি আর আছে এখন ॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন স্বভাবে শেষে, কালি দিলে বঙ্গে এসে
তরিলে জলধি জল পোড়াতে স্বর্ণ ভবন ॥

ঝুমুর

১৫। স্বামী : শালুক লাগার আঠার দড়ি
হাল ধরতেই পড়ে মরি
বাবুর মা বাবুর মা
আজ আমাকে ভয়েই মরালি।
স্ত্রী : নীল লটা কাট্টে কাট্টে
হাত গেল ফাট্টে হে
খকার বাপ খকার বাপ
দে না টুকু কাঁচা হলুদ বাইটে।
স্বামী : দাদন দিল হপকি সাহেব
দশ টাকা লেল হে
মহাজনকে বহাল ক্ষেত্রে করি নীল চাষ।
স্ত্রী : শিখরের আকালে
শিয়াল কুকুর কাঁদে
পিয়াল পাকা বাবুর বাছা
দে না দুটা পিয়ালি পাকা পাড়ো *

১৬। **প্রবাদ**

(ক) নীল করের পৌষ মাস
নীল চাষীর সর্বনাশ।
(খ) শ্বশুর বাড়ী যাবার পথে রেনী সাহেবের খড় কাটা

---

* শব্দ এবং ভাষার প্রয়োগ দেখে অনুমান, এই গানটি হয় পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

শ্রদ্ধেয় নরহরি কবিরাজ তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা' গ্রন্থে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

"কোম্পানির আমল শুরু হবার আগে পর্যন্ত সাঁওতালদের জীবনযাত্রার ধারা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। কোম্পানির রাজত্ব ক্রমেই দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকল। সাঁওতালদের বাসভূমিও বাদ পড়ল না। ক্রমশঃ কোম্পানির রাজত্বের অংগ হিসাবে এ অঞ্চলে দেখা দিল এক দল রক্ত চোষা জমিদার, নীলকুঠির সাহেব দালাল. মহাজন, সরকারি আমলা দারোগা প্রভৃতি। এদের সকলকে নিয়ে কোম্পানীর আমলে যে অভিনব নির্যাতন ব্যবস্থা সৃষ্টি হলো সুস্পষ্ট তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত।"

সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনাকাল ১৮৫৫। এই বিদ্রোহ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) সাঁওতাল প্রাণ দিয়েছিল। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বহু দিন ধরে চলেছিল এবং বীরভূমের ভগ্নাডিহি থেকে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বাঁকুড়া, ও মেদিনীপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন দুই ভাই সিধু ও কাহ্নু।

সিধু সিধো বা সুভা একই ব্যক্তি।

এই বিদ্রোহ যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর মানুষ যেমন কামার তিলি ইত্যাদি বিদ্রোহে যোগদান করে এবং সাহায্য করে। সাঁওতালরা ভগ্নাডিহি অঞ্চলকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং জমির খাজনাও কমিয়ে দেয়।

জনৈক ব্রাহ্মণ লিখিত একটি দীর্ঘ ছড়ায় এর বিবরণ পাওয়া যায়। ছড়াটিতে শুধু ধ্বংসের বিবরণ আছে।

ছড়াটির শুরুতে আছে—

শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
শুভা বাবুর আদেশ পেয়ে সাঁওতাল ক্ষেপেছে ইত্যাদি।

বীরভূমের গৌরহরি মিত্রর 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' গ্রন্থ থেকে খানিকটা তুলে দিলাম।

১। শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
শুভা বাবুর আদেশ পেয়ে সাঁওতাল ক্ষেপেছে।
আছে সব জড় হয়ে

আছে সব জড় হয়ে পূর্ব মুখে
তীর মারিছে গাছে
কতশত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তীরের ফলা বানাইছে
তীরের ফলা বানাইছে
বরাত মতে
যখন যেমন হয়,

হাতে হাতে বানাইছে ফলা পাছে কিনা হয়। ইত্যাদি

নীচের গানগুলি মূল সাঁওতালি ভাষা থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত এই প্রবন্ধের লেখক করেছেন।

২। আমরা প্রজা সাহেব রাজা
দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটব মোরা
এমনি নরাধম।
মোরা শুধু ভুগবো
না না মোরা রুখবো।

৩। ও সিধো সিধো ভাই তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা ও কানহু তোর ছল ছল স্বরে
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জাননা কি দস্যু বণিক লুঠলো সোনার দেশ।

৪। প্যায়দার চোখে জ্বলে আগুন প্রতিহিংসার
দারোগার দেহে দয়া নাই শুন মিথ্যাচার।
মনে নাই সুখ প্রাণে নাই আশা,
টগবগে ঘোড়ায় দারোগার আসা
চকচক করে পিস্তলের সাজ প্যায়াদার।

৫। আমাদের স্ত্রী-পুত্র লাগি
জমি চাই চাই বাস্তু ঘর
ফিরে চাই গরু মোষ ছাগি
ফিরে পেতে চাই সে লাঙল।
এ-সব কিছু পেতে হলে
করতেই হবে বিদ্রোহ

তৈরী হও ভাই সাঁওতাল
অস্ত্র হাতে তুলি লহ।

৬। বাঁচতে হবে আমাদের
বাঁচব নিজেরাই
মোদের পাশে আজ
দাঁড়াতে কেউ নাই,
বিদ্রোহ করব মোরা
সত্য করব বিদ্রোহ
দেশের যত মাঝি আছে
তাদের সাথে সাথে লহ।
থাকবে তারা মোদের সাথে
থাকবে পরগণায়া গুণ
থাকবে গাঁয়ের মোড়ল ভাই
ভাবনা নাই কোন,

৭। উঠ, জাগো, এসো জাগো এগিয়ে চল
মোদের জন্মভূমির স্বাধীনতায় এগিয়ে চল

৮। সিঙ জংগল শিকারে যখন যায়
মাঝ রাত হয় সরগরম্
ভয় নেই, নেই ক্লান্তি দেহে
দেহের রক্ত হয় গরম।
দরবারে যায় কলকাতা সবে
পেতে সুবিচার লাটের কাছে
সারা দিন সারা রাত কাটে পথে
সাহস ধৈর্য তবু আছে।

৯। এসো ভাই, শোনো ভাই
দেখো ভাই যায়
হায় হায় হায়।
ভগত কেনারাম ঘোড়ার পিঠে
সওয়ারি হয়ে যায়
হায় হায় হায়।
ঘোড়া চলে টগ্‌বগিয়ে

কেনারাম যায়
হায় হায় হায় ।

১০। পরগণার কাছে বললাম মোদের দুখ
প্রার্থনা করলাম সুবিচার কর
হায় হায় সে প্রার্থনা ব্যর্থ হলো ভাই
এবার হাতে হাতে অস্ত্র তুলে ধর ।
কেনারাম দারোগা মিছাপুর মেলায়
টগ্‌বগিয়ে ঘোড়ার পিঠে যায়,
পেয়াদাদের সঙ্গে সাথে নিয়ে
হত্যা কর মিছাপুরে গিয়ে ।

১১। বলব মোদের পাশে এসো
যদি না আসে
বলব মোদের কথা শোনো,
যদি না বিশ্বাসে—
আমরাই করব বিদ্রোহ
নিজেরাই দাঁড়াব শোনো ভাই
সাহায্য বা আশ্রয় যদি না পাই
ক্ষতি নাই, ক্ষতি নাই, ক্ষতি নাই !
ভগত কেনারাম শুনে যাও
আমরা দাঁড়াব নিজেরাই
আমাদের পাশে কেউ যদি না আসে
ক্ষতি নাই ক্ষতি নাই ক্ষতি নাই ।

১২। এই বিদ্রোহ আমাদের
জমি ভিটের তরে
এই বিদ্রোহ আমাদের
লাঙলের তরে ।
এই বিদ্রোহ আমাদের
গরু মোষ তরে
এই বিদ্রোহ আমাদের
সম্পত্তির তরে ।
যা ছিল আজ নাই
ফিরে পেতে চাই তাই

এ বিদ্রোহ আমাদের
বাঁচবার তরে।

১৩। পহিলে দক্ষিণ জংগল যা বাঘ ভাল্লুকা বাসা
সাঁওতাল লোক সাফা দিয়া সঠিক দেশ এইসা।
এক বিঘা জমি নেহি যা দামিনকোলমে
লাখ বিঘা জমি হুয়া দেখ নজর মে।
আট আনার দর সে পঞ্চাশ হাজার শাল,
এইসা প্রজার অবিচার মে হোগা বেহাল।
গোলাদার বাংগালি দামিনের মহাজন,
তাদের কাছে কিছু নয় সাঁওতাল প্রজাগণ।

১৪। শ্রাবণ মাসে একটাকা নিলে
আট মাসে তা একুশ টাকা হল,
বার টাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া
গরু বাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া।
দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে
সেও বলে শালার ব্যাটা টাকা দিতে হবে।
এই মত ধন মোদের সকল হরে নিল
এই জন্য দামিতে হাংগামা রইল।

সিপাহী বিদ্রোহ

সারাদেশব্যাপী ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ হয়, তা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে প্রচারিত হলেও মার্কস্ এই বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপে দেখেছেন এবং সেই মত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই সংগ্রামে দেশীয় নৃপতি থেকে কৃষক ঘরের সন্তানরা, যারা সিপাহীর কাজ করত—সকলেই এক সাথে একই উদ্দেশ্যে প্রাণকে তুচ্ছ করে সশস্ত্র অংশ নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ কি চোখে এই বিদ্রোহকে দেখেছিলেন, কয়েকটি গানে তা প্রকাশ পেয়েছে।

১। মাটি আর পাথর থেকে
রাণী গড়েছেন তার সৈন্য
কাঠ থেকে
তিনি বানিয়েছেন তরবারি
পাহাড়কে করেছেন তিনি ঘোড়া
সোজা ছুটছেন গোয়ালিয়র।

২।   গাছগুলো কেটে ফেল
ঝাঁসীর রাণী আদেশ দিলেন।
যাতে ফিরিঙ্গীরা আমাদের সৈন্যদের
ফাঁসী দিতে না-পারে
ফাঁসী দাও! গাছে ঝুলিয়ে দাও!
গাছগুলো কেটে ফেল
যাতে রোদ্দুরে তারা ছায়া না পায়।

৩। কি সর্বনেশে যাদু বলি গো তোমায়
কলিযুগের মাহিত্মন দোষ দিও না আমায়।
নবাব বাদশা গেল তল
উর্দি পরা চ্যাংড়া বলে কত জল।
হায় হায়রে যাদু পান্ডা* মহাশয়
বেরিলিতে দাংগা হইল ফৈজাবাদে আটক রয়!
যত সব রাজপুরুষ মেম আর সাইব মহাশয়।
দেশে দেশে লাগল ধান্দা
হিন্দু আর মুসলমান
জাতির পতিত অতি গর্হিত
এই দুঃখে সব করে বেহিত।
হিন্দুর অখাদ্য খাদ্য গোমাংস
মুসলমানের হারাম শূকুর মাংস,
দুয়ে মিলে টোটা বানায়
সাদা চামড়ায় গুলি চালায়।
আরও আছে মজার কথা কইতে লাগে ডর;
কোম্পানির ফৌজ আসি কান্ধে করবে ভর।
এই সব হল আত্মগ্লানি বহুদিনের ব্যাধি,
দুই ভায়েতে এক সাথেতে উঠল এবার মাতি।
ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তুংগ ঘোড়ায় চড়ে,
বীরদর্পে শস্ত্র চালায় ইংরাজ মাঝারে,
ও তার মূর্তি দেখে ভিরমী লাগে, চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত,
শত্রু সেনা কেটো চলে সংগে নিয়ে দশটা হাত।

* পান্ডা—মংগল পান্ডে

মা গো তোমায় গড় করি গো সংগে নিয়ে বরাভয়,
শত্রু সেনা ধ্বংস করি এস তুমি এ বাংগালায়।
হায় গো মোদের আশা ভরসা, সব বুঝি ফুরাল,
কোম্পানিরই জয় হল আশার প্রদীপ নিভিল।
মরল যত গুলি খেয়ে দেশের বড় নেতা
তাই না দেখে দেশবাসীর ধরেছে আজ মাথা।
অধম রাধানাথে বলে শেষে ধরি দুটি হাত,
একত্র হইও, না করিও বিসম্বাদ।

ভাদুগানে

৪। হায় এ কি হইল
সিপাই পল্টন খেপিল
চারি দিকে মার মার কাট কাট
যত সিপাই খেপেছে
কাশিপুরে মহারাজা
মহল ছাড়্যে আস্যেছে।
৫। কাশিপুরের মহল ছিল
ছিল সুখের বিন্দাবন
সে মহলে ঘাস বিরালো
কি করছে নীলমোহন*
৬। চার দিকে চার রাণী বৈস্যে
রাজার মন হয় উল্লাসী
চাকর দ্যাখে বলেন রাজা
সভবজ্জি খেলিনি যে ॥
৭। যখন রাজা আলিপুরে
তখন ধাইরা যায় ছুটে
রাণী দিকে বলে দাওগা
হাতের শংখ খুলিতে।
৮। রাণীরা সব কেঁদে বলেন
সুরগুঞ্জা পাঠাই চিঠি

* নীলমোহন—নিলমনি সিং

আমার বাবা পল্টন দিব্যেন
নীলমণি হবেন ছুটি।

টুসুগানে

৯। কলকাতাকে গেলে টুসু মকদুমায় কি হাল,
মকদুমাই ডিগ্রি করে নীলমণি বাঁধাই গেল
ওরে শিখির দেশে।
নীলমণি রাজার বেটা পুরুল্যা দখল করে।
আমার টুসু হাঁস্যে হাঁস্যে, জলকে সিনান করতে চলে।

১০। কাশীপুরের মহারাজা ধনী নীলমহন
তুমার কাছে হার মানল রাঙা মুখা পল্টন।
সিপাইরা সব লুঠ কারল পুরুল্যার খাজাঞ্চীখানা।
রাঙামুখা সাহেবগলার হাল কি গো লাঞ্ছনা (?) (লাঞ্ছনা)
পল্টনরা এগাঁই আল্য যাবেক রঘুনাথপুর,
তুমি তাদের বাধা দিলে, হুকুম দিলে কৎরতে দুর।
পান বাঁচাতে ফিরে গেল যত সাহেব পল্টন
কাশীপুরের মহারাজা ধন্য নীলমহন॥

গম্ভীরা গানে

১১। বুঝি ফিরিঙ্গিদল এবার ভাইরে খোবে নিলে খাঁটা
সিপাহী সব মিলে অদের করলে বলির পাঁঠা।
গরু আর শুয়রের চর্বি দিয়া করলে যে রে টোটা
হিন্দু আর মুসলেমের বুকে মারা দিল খুঁটা
জাতি ধর্ম নাই এক ফোঁটা।
(পরে) দুই ভায়েতে শল্লা (?) কোর‍্যা (? তাদের না চ্যাৎ
মারছে ফাঁটা (সল্লা, কর‍্যা)
বারাকপুর আর রাণীগঞ্জে গেল আগুন লাগ্যা।
ফিরিঙ্গি সব তলপী ছাড়া, গালো কুন্ঠে ভাগ্যা
সিপাহীদল থাকল সব র ইগ্যা
গোটা ভারত উঠল জাইগ্যা।

লোক—৬

সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ

সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ হয় ১৮৭০ সালে। সন্দ্বীপের জমিদারগণ আইন মোতাবেক সূর্যাস্তের পর রাজস্ব দিতে না-পারায় তাদের জমিদার ইজারা দেওয়া হয়। পরে ইজারা ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জমিদারের আবির্ভাব ঘটে। কোর্জন (কার্জন নয়) সাহেব জমিদারী কিনে নেয়। খাজনা আদায় ও জমিদারী শক্ত হাতে থাকে। এর ফলে প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রজারা বিদ্রোহ করলে মুন্সী চাঁদ মিঞা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। বিদ্রোহ দেখা দেয় সর্বত্রই। বিদ্রোহে কি কৌশল গৃহীত হবে এবং কি তাদের করণীয়. সেই বিষয়ে একটি গান রচিত রয়। গানটি সর্বত্রই গীত হতো। গ্রীয়ার্সন সাহেব সন্দ্বীপের ভাষার নমুনা স্বরূপ তাঁর 'লিংগুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া'র পঞ্চম খন্ডের প্রথম অংশে উধৃত করে দিয়েছেন।

১। কিয় হাইচিনির বাপ আইলনা কাইল বৈঠছে।
** আমিন ক'দিন ফিরব চহে চহে

('কি হে আইছিনির বাবা কাল বৈঠকে আস নাই কেন' আমীন কত দিন চকে অর্থাৎ মাঠে মাঠে ঘুরবে।)

২। গোলায় গোলায় সাপুক গই যাই চিন দিতাম ন জমিনে।
বেল্লিশ সনের চিড়াদি আর কিন্তু হারে আমিনে।।
মাইরা গেলে বাড়ীতে দাইয়া যাইয়ুব সহাতে
আশুরতে নেই দিব হেতে বাড়ীত্ নাইলকান্ডা যাচ্ছে।

(জমিতে কোন চিহ্ন দিব না, মাঠে মাঠে মাপ জোক করুক গিয়ে। বিয়াল্লিশ সালের চিঠা অর্থাৎ কংচা হিসেব দিয়ে আমীন আর কি করবে। মারবার জন্য বাড়িতে গেলে দূরে পালিয়ে যাব, স্ত্রীলোকেরা বলে দিবে, সে বাড়িতে নেই, কলকাতায় থাকে।)

৩। হুইচিনির বাংছাবেরা চান মিয়ায় যে কই হাজইছে,
লাল বলদ লাগাই দিউস যেত্তের বাড়ীতে আমিন আছে!

(ভাই সাহেবরা তোমরা শুনেছ চাঁদ মিঞায় কি বলে পাঠিয়েছে? যার বাড়িতে আমীন আশ্রয় পাবে তার বাড়িতে লাল বলদ অর্থাৎ আগুন লাগিয়ে দিব।)

৪। জুম্মায় নমাজ পইরেতে হুনলাম মদিদে ছুক্লা,
জরিপ কইরতাম দিতাম ন বাই যার যাবে কেল্লা।

(জুম্মায় নমাজ পড়তে পড়তে মসজিদে পরামর্শ শুনলাম, মাথা যায় যাবে কিন্তু ভাই সব জম জরিপ করতে দিব না।)

৫। জমার পর চান্দা দরু আন্টে আনা তোলার পর
চটি গ্রামের হুনলাম খবর গোলজারের বাপ বোড্ডে গেছে,

(জমার উপর আবার চাঁদা টাকায় আট আনা দরে। চট্টগ্রামের সংবাদ শুনলাম, গোলজানের বাবা বোট্রে অর্থাৎ রেভেনিউ বোর্ডে গিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ

১৮৭২-৭৯ সালে সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ ঘটে। সিরাজগঞ্জ ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত। কেউ কেউ একে পাবনা প্রজা বিদ্রোহও বলে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমিদার ও ইংরাজদের অত্যাচার নিপীড়ন। ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করা, জমি থেকে উচ্ছেদ করা তো ছিলই, ম ত্রাতিরিক্ত শোষণ-পীড়নের ইতিহাসে এই অত্যাচার ছিল অভিনব। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ঈশান রায়। এঁকে বিদ্রোহীরা রাজা বলত। বিদ্রোহীদের রাজা বলেই ইনি পরিচিত ছিলেন। পাবনা জেলার ইতিহাস লেখক রাধারমন সাহা তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি লোক সংগীত ছড়ার উধৃতি দিয়েছেন। সেগুলিই নীচে লিখিত হলো।

১। দৌলতপুরের কালীরায়ের বেটা
ঈশান রায় বাবু ॥
ছোট বড় জমিদার রেখেছেন কাবু।
তার নামের জোরে গগন ফাটে
আস্ট (রাস্ট্র) আছে জগৎময়।

২। বংগ দেশে কলি শেষে ঘটল বিষম দায়
মানিব লোকের জের হয়েছে বিদ্রুকের জ্বালায়॥
যত প্রজা লোকে জোটে থেকে জমিদারকে বেদখল দ্যায়,
নালিশ করে শাস্তি রক্ষা, জুলুম-নিষেধ প্রজার পক্ষে
তার রাজা হল নিশান (ঈশান) বাবু কাল সাপ জমিদার।
গোপালপুরের জমিদারের লুঠলো বাড়ী ঘর ॥
সে বিদ্রুক-আলো ঘর জ্বালালো চমৎকার সব জমিদার।
শুনে হয় শঙ্কিত বিদ্রুপের কটাং কত।

নিশান রায়ের হুকুম গত লোক চলে হাজার হাজার ॥
জোটায়ে মামলা নিশান বাবু করছেন কাবু মনিব লোক কত
অস্থির হল জমিদার আর তালুকদার যত।

৩। কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপরে বাপ মলেম মলেম।
কি তামাসা সকল চাষা ভেবেছিল রাজা হলেম ॥
হাতে পলো কাঁধে লাঠি লোটে যত ঘটি বাটি।
মাংনা খাব রাজার মাটি ভয়ে ভীরু অবাক হলেম।
দেশের যত বামুন ভদ্র তারা কি আর আছে ভদ্র।
বিদ্রোহীর দল দেখা মাত্র নজর আর রাজায় সেলাম।

৪। গোপালনগরের জমিদাররা তারা কেঁদে ম'ল।
ডেমরা থেকে রাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল ॥
কাশি কাঁদে মহেশ কাঁদে কাঁদে তাহার খুড়ি।
গোলামের ব্যাটা বিদুক আসে' লুটল সকল বাড়ি ॥
বিদুক আসে' লুটে নিল গাছে নাইক পাতা।
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থাকে ফুকচি মারে মাথা।

৫। ও চাচা বিদ্রোহী দলের কথা কব কি
নূতন আইন নূতন দেওয়ান কালু পালের বেটা
সকলের আগে চলে মাথায় বাঁধা ফ্যাটা ॥

গ্রন্থ পঞ্জী

১। লোক সঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস
২। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা—নরহরি কবিরাজ
৩। ঐ
৪। Rangpur Gezettier.
৫। Hunter—Annals of Rural Bengal ; Vol. I.
৬। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১ম খণ্ড সুপ্রকাশ রায়
৭। 'সিসৃক্ষা' মাসিক পত্রিকা, চিত্ত মণ্ডলের প্রবন্ধ, শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা
৮। ভাদু ও টুসু—রামশংকর চৌধুরী
৯। বীরভূমের ইতিহাস—গৌরহরি মিত্র
১০। মাসিক পত্র 'লোক ও লৌকিক' ১ম ও ২য় সংখ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের প্রবন্ধ
১১। বাংলার পল্লী গীতি—চিত্তরঞ্জন দেব
১২। লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা—ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ
১৩। Myth and Reality—D. D. Kosambi.

লোথা অন্যান্য নাগাদের লোকসঙ্গীত

নাগাদের, নাগা বলা হয় কেন, সে বিষয়ে মিঃ জে, পি মিল, যিনি ১৯১৭ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। তাঁর পূর্বে Mr. J. H. Hutton C.I.E, Hon. Director of Ethnography, Assam, নাগাদের বিষয়ে অনেক কিছু গবেষণা করেছেন। তিনি নাগা শব্দের অর্থ করেছেন এই রূপ

Naga is a corruption of the Assamese Naga (Pronounced "Naga"), probably meaning "a mountaineer" from sanskrit Nag, a "mountain" or inaccessible "place".১

এদের কেন, কোনো নাগা ট্রাইবেরই মৌলিক উৎপত্তি এখনো অন্ধকারের গর্ভে। এঁরা তাদের উৎপত্তি বিষয়ে একটি লৌকিক উপাখ্যানের উল্লেখ করে বলেন, যে এক মা পর্বত গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নাগাদের জন্ম দেন। কোথাও কোথাও আবার বলা হয় এক বন্য মানুষ, নাগাদের জন্মদাতা ২ আবার Mr. J.P. Hills I.C.S. বলেন, "Usual tradition, however, gives the Lothas an autonomous origin, and is almost identical with that told by the Angamis of themselves. The story goes that three brothers, Limhachan, Izumontse and Rankhanda, the ancestors of the varioties of the tribe, came out of a hole in the earth near the miraculous stone at Kezakenoma. ৩

হটন সাহেবের অভিমতানুসারে এখন যে পরিসীমায় নাগারা বাস করে বা অধিকার করে আছে, সেই স্থানে তারা প্রথমে বিভিন্ন দিক থেকে এখানে বাস করতে আসে। প্রথম দলটি আসে তিব্বতের দিক থেকে ও নেপালের দিক থেকে, সিংযোগ নাগারা এই দিক থেকেই আসে। তাঁর বিশ্বাস আকাস (Akas) মিসমিস (Mishmis) এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড় থেকে অন্যান্য ট্রাইবরা এসে উপস্থিত হয়। এমন কি নিশ্চিত করেই বলা যায় বোড়ো, গারো, সিকির এবং কাছারি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড় থেকেই আসে। দ্বিতীয়—ইরাবতী উপত্যকা অতিক্রম করে দক্ষিণ চায়নার দিক থেকে থাই জাতি শানস, অহোম, টামনস প্রভৃতি এসে উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ দিক থেকে বিভিন্ন ট্রাইবের আসা অব্যাহত থাকে।৪ হিল মনে করেন লোথা নাগারী, দক্ষিণী সাংগটাম, সেমাস এবং রেংমাস যাও এর কোনো জায়গা থেকে এসে বাস করছেন।৫

আমাদের বিষয় নাগাদের নৃতাত্ত্বিক বা জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় দেওয়া নয়, যদিও ফোকলোর নৃতাত্ত্বিকদের একটি অধীতব্য বিষয়।

নাগারা এখন আর ১৯১৭-১৮ সালের নাগা নেই। তাদের অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি তাদের নিজেদের রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগাদের উন্নত অবস্থা নিঃসন্দেহে সবারই কাম্য। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের নিকট এখনো অনেক কিছুই আড়ালে থেকে গেলো, এটাই তাঁদের দুঃখ।

আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন নাগাদের, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এদের অনেকেই আজ ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত। আজ এরা তাদের Traditional সংগীতগুলির পরিবর্তে চার্চ সংগীত গাইছে। Mr. Filkin Laloo, Folk music and Folklore Research Institute এর সংগে এক সাক্ষাৎকারে খাসি ও জয়ন্তিয়া হিলের লোক সংগীত সম্পর্কে বলেন মিশনারীরা আসার পূর্বে তাদের Traditional সংগীতগুলি বিভিন্ন রিচুয়েলে এবং লোক উৎসবেই গীত হতো তার সুরও ছিল ভিন্ন কিন্তু Western Church যখন থেকে তাদের মিশনারি কাজ কারবার শুরু করল তখন থেকে তাদের সংগীতের পরিবর্তন এলো। বর্তমানে পাহাড়ী গান বিশেষ করে চার্চ সংগীত দ্বারাই প্রভাবিত। সর্বশেষে Mr. Laloo বলেছেন, Assam hills are astir with a new movement of self determination, and vast masses who were once so slow moving have now been engulfed in a sweeping political turmoil. If progressive composers compose songs with robust themes of humanism, patriotism, international brotherhood and peoples' unity based on our traditional tunes, this will I am sure, immediately catch the imagination of our people. ৬

নাগাদের বোধহয় এ অবস্থাও নেই। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন লোথা নাগাদের কী যে অপরিসীম ক্ষতি করেছে, সংক্ষেপে তার বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি।

নাগাদের প্রতিটি গ্রামে অবিবাহিত প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক এবং যুবতীরাও রাত্রি বেলায় মোরাং এ বাস করত—একে বলা হত bacheler hall. এই যুবক যুবতীরা গ্রামের সবারই জমিতে শস্যোৎপাদন এবং শস্য ঘরে নিয়ে আসত বিনা পারিশ্রমিকে, গ্রামের সাধারণ কাজে আত্মনিয়োগ করত—এই মোরাংকে মিশনারীরা ভেঙে দেয়। মোরাং ছিল যুবক যুবতীর পবিত্র মিলন ক্ষেত্র, একে কেন্দ্র করে কতো গান কতো নাচ তারা করত, যা সমস্ত গ্রামকে রাখত মাতিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো দিন কোনো ব্যভিচার লক্ষিত হয়নি।

আজ লোথা নাগাদের কাছে এটি অতীত স্মৃতি। মিশনারীরা ক্রীশ্চান ধর্ম অবলম্বন করেছে এমন মানুষদের শিখিয়েছে, যোরাং ব্যবহার করা নীতি বিরুদ্ধ।

আউ নাগাদের মধ্যে কারো ধনদৌলত বেশী থাকলেই সে সমাজে এক জন মান্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতো না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি সব নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য ব্যায় করত, তবেই সে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হত। ধনী ব্যক্তি গ্রামস্থ এবং অন্য গ্রামের মানুষজনদের ভুরিভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করত। যে সব খাদ্যদ্রব্য পচে যাওয়ার আশংকা ছিল, তা প্রত্যেককে বিলি করা হতো। মিশনারীরা এক পরিবর্ত শিক্ষা দিল, নিজেদের ধন সম্পত্তির অপচয় নয় তাকে রক্ষা কর ও বৃদ্ধি কর।

আউ এবং অন্যান্য নাগারা ধেনো মদ (rice wine) তৈরি করত তাদের উদ্বৃত্ত চাল দিয়ে। যার জন্য একটি দানাও খরচ করতে হত না। এই মদ ছিল তাদের শক্তি বর্ধক। ধেনো মদ পান করে তারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ অবহেলে অনায়াসে করতে পারত। সেই মদ খাওয়া বন্ধ করে দিল ব্যাপটিস্ট মিশন, তার পরিবর্তে তাদের শেখানো হলো বীয়ার ও অন্য সব আমদানি করা মদ খেতে।

এরা চা খেত না। মিশন এদের দুধ বিহীন নিকৃষ্ট চা খেতে শেখাল। যার জন্য তাদের অর্থও খরচ করতে হত।

নাগাদের জাতীয় পোষাকের পরিবর্তে শেখানো হলো পশ্চিমী পোষাক ব্যবহার করতে। এরা যে নিজের নিজের ঘরে বস্ত্র উৎপাদন করত, কি চিকনের কাজ করা চাদর তৈরি করত, তাও গেলো ধ্বংসের দিকে। অর্থনৈতিক ভাবে ক্রীশ্চান নাগারা দুর্গতির পথে একটু একটু করে গোলো এগিয়ে। শেষ পর্যন্ত এদের অনেককেই চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হলো।

এসব না করে, মিশন যদি কোনো শিল্প স্থাপন করত, কিম্বা উন্নতমানের চাষের ব্যবস্থা করত তবে অনেক বেশী উপকার করা হত। কোনো সৃষ্টিমূলক কাজ তারা করল না ধ্বংসের কাজটি পুরোপুরি সমাধা করল।

নাগাদের কারু শিল্প, চারু শিল্প শেষ হলো তাদের মধ্যে যে একটা সামাজিক দৃঢ়তা ছিল তাও শিথিল হলো, ক্রীশ্চান অক্রীশ্চান এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। নিজেদের Traditional সঙ্গীতের সুরকে ভুলিয়ে দিয়ে চার্চ সঙ্গীতের প্রচলন করা হলো, বাৎসরিক যে পান ভোজনের উৎসব, (Grand feast) তাও বন্ধ হয়ে গেলো।

সংক্ষেপে এই হলো মিশনারিদের অবদান। ৭

নাগারা অনেক গোষ্ঠীতেই বিভক্ত, যথা আউ, (Ao'1, আংগামী, রেংসা, কেনিয়াক্, সাংটাস, কাচা, কুকি, সেমা, ও লোথা ইত্যাদি। অন্যান্য নাগাদের বিষয়ে আমি কোনো আলোচনা করছি না, লোথা নাগাদের সংগীত বিষয়েই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো, প্রসঙ্গক্রমে এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও সংক্ষেপে আলোচিত হতে পারে।

নাগারা প্রধানত চাষী, চাষের কাজে এরা অত্যন্ত দক্ষ। প্রচুর ফলন কিভাবে হবে, এই হলো এদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। চাষের কাজকে অবহেলা করে বা পরিত্যাগ করে এরা সরকারি চাকরিও গ্রহণ করত না। যদি কেউ কখনো চাকরি করতে যেত, মন পড়ে থাকত এদের চাষের জমির প্রতি। যার ফলে ঠিক চাষের সময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা নিজের গ্রামে ফিরে যেত। ভাতই এদের প্রধান খাদ্য! অন্যান্য শস্যও যে উৎপাদিত না হত তা হয়।

জুম চাষের পদ্ধতিতেই এরা চাষ করত।

বন কেটে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চাষের উপযোগী স্থান করে নিতে হয়। আগুনের ছাই মাটিতেই পড়ে থেকে সারের কাজ করে। যাদের জমির পরিমাণ কম তারা প্রতি দু বছর অন্তর জঙ্গল কাটে, যাদের পরিমাণ বেশী তারা কয়েক বছর বেশি একই জমিতে চাষ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একটা জমিতে পর পর দু বছরের বেশী চাষ করা যায় না। গড় হিসাবে দেখা যায় প্রতি দশ বছরে এক বার একটি জমিতে চাষ হয়ে থাকে।

নিজেদের গৃহস্থালীর বা সংসার জীবন যাপন করতে যা যা প্রয়োজন তা এরা নিজেরাই করত। মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজ করেও নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করত। এই কাজ করত যারা, তারা তার পূর্ব রাত্রে কোনো প্রকার যৌনাচারে লিপ্ত থাকত না বা এমন কোনো দ্রব্য ভক্ষণ করত না, যাতে মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোয়। মাটির হাঁড়ি কলসী ও অন্যান্য সামগ্রী পুরুষরা তৈরি করত। মাটির পাত্র তৈরির ক্ষেত্রে পুরুষদের অধিকার থাকলে, মাটির হাঁড়ি কলসীকে যখন আগুনে পোড়ানো হত, তখন কোনো পুরুষ সে দিকে দৃষ্টি দিত না, এদের বিশ্বাস পুরুষ দৃষ্টি দিলেই তা ফেটে যাবে। এমন কি এ বিশ্বাসও ছিল, যদি কোনো কুকুরের লোম কাঁচা মাটির পাত্রের কোনো অংশে লেগে থাকে, তবে পাত্রের সেই অংশটিতে ছিদ্র হবে, এই কারণে কোনো কুকুরের কাছে যাওয়া চলত না।

কামারের কাজ সব লোথারা করত না। এর জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবার ছিল, এর কারণ হিসাবে জানতে পারা যায় লোহার কাজ যারা করে, তারা বেশী দিন বাঁচে না। যে সমস্ত গ্রাম আসামের সমতল ভূমির সন্নিকট, সেই সব গ্রাম

সমতল ভূমি থেকেই লোহার অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে আসত। রেংমারা খুব লোহার কাজে খুব দক্ষ ছিল, তারা দক্ষিণী লোথাদের সমস্ত রকম অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত, উত্তরাংশের লোথাদের সরবরাহ করত আউ (Ao) নাগারা।

যেহেতু বাঁশ আর বেতের কোনো অভাব ছিল না সেই হেতু লোথারা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি ঝোড়া ইত্যাদি তৈরি করতে পারত। পুরুষরা, এ কাজ কোনো মতেই কোনো মেয়েকে দিয়ে প্রস্তুত করাতো না।

নানা প্রকার কাঠের কাজেও ছিল এদের দক্ষতা। পুরুষরা আরহিংয়া গাছের বল্কল থেকে জাল বোনে এবং এই জাল একটি গোলাকার ফ্রেমে বেঁধে দেয়। এ কাজ কদাচ মেয়েরা করত না।

কোনো পুরাতন Traditional মুদ্রার প্রচলন ছিল না। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত মুদ্রার ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত ছোট খাটো বাণিজ্য বিনিময় পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এখনো এ প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। লোথা নাগারা পাহাড় থেকে সমতলে তুলা নিয়ে যায়, তার পরিবর্তে নিয়ে আসে লবণ।

চাষের কাজে বীজ বপনের পূর্বে অনেকগুলিই অনুষ্ঠান করতে হয়। এ সব অনুষ্ঠানে পুরোহিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এ-সব অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অনুষ্ঠানগুলির নাম বলা যায়। প্রথম অনুষ্ঠান ট্রুভেন, এই অনুষ্ঠান প্রথমে পুরোহিত করে, তারপর দিনকয়েকের মধ্যে অন্যরাও করতে পারে, অবশ্যই যারা একটি বৃহৎ পাথর টেনেছে। এই অনুষ্ঠানে ক্ষেতের বাইরে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় করা হয়। এর অনুষ্ঠানসূচি দীর্ঘ। দক্ষিণী লোথারা Motharatsen অনুষ্ঠান করে। এ অনুষ্ঠানও পুরোহিতেই করে যখন কিনা শস্য অর্ধেকটা বেড়ে উঠে। এটা করার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে ছোট ছোট সাদা পোকায় শস্য নষ্ট না করতে পারে। এদের বিশ্বাস শস্য যদি না হয় এত সব অনুষ্ঠান সত্ত্বেও তবে বুঝতে হবে অন্য কোনো গ্রামে জনৈক আগন্তুক Puthi অথাৎ পুরোহিতের ঘরে গিয়েছিল যখন কিনা 'পুথি' তার গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে মাত্র চাঁদা স্বরূপ চাল সংগ্রহ করেছে কিন্তু অনুষ্ঠান করেনি। ভাল শস্যের জন্যও আবার অনুষ্ঠান করা হয় যাকে বলা হয় Amungkam। এর পরের অনুষ্ঠান Rangsikam উৎসব। লক্ষ্মীকে এরা Rangsi বলে লক্ষ্মীকে ভাল শস্য দেবার প্রার্থনা করে।

এদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই মুরগী ছানার মাংস ভাত, মধু অর্থাৎ মদ উপাচার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে প্রতিটি

অনুষ্ঠানের পূর্ব দিনে এরা অত্যন্ত পবিত্র জীবন কাটায়। যৌনাচার একেবারেই নিষিদ্ধ।

এবারে সঙ্গীতের কথায় আসি।

শস্যকে নিয়েই এদের সংগীত। কি করে ভালো ফসল হবে, কি করে তা খামারে নিয়ে আসবে—এই সবই সংগীতের বিষয়। সংগীতের সুর সম্বন্ধে এরা এত রক্ষণশীল, তা অন্যান্যদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। শস্য বপন পুরুষ নারী একযোগেই করে থাকে। শস্য বপনের সময় এবং শস্য মাড়ার সময় গুণ গুণ সুর ভাঁজে। কিন্তু দুইটি সুরই পৃথক। বপনের সময় শস্য মাড়ার সুচরা শস্য মাড়ার সময় বপনের সুরে গান গাইলে শস্যের ক্ষতি হয়, এই এদের বিশ্বাস। এতে Rangsi অর্থাৎ শস্যের দেবী কুপিতা হন।

এই সব সংগীতে তিন ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

১) শিংগা, একে বলে Phuphu। এটা হয় প্রায় ষোলো ইঞ্চি লম্বা বাঁশ দিয়ে। এই দিয়ে একটু গম্ভীর আওয়াজ বোরোয়; ২) আবার আরো এক রকমের শিঙা তৈরি করে কোনো হাল্কা কাঠের মজ্জাটা বের করে দিয়ে লাউ-এর শিঙাসদৃশ অংশ দিয়ে। এটি হয় সাড়ে চার ফিট লম্বা। লোথাদের কান গানের সুর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ; এমন কি সুর শুনে সে আশ্চার্যজনক ভাবে শিঙা বা ভেরির আওয়াজ করতে পারে। লোথা সংগীত শিল্পী ফ্লুট (Philili Phiphohili) বাজাতে অত্যন্ত দক্ষ। এটি হয় সরু বাঁশের টিউব। লম্বা প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি। এর দুই দিকই খোলা। মোটা অংশের শেষ দিকটি প্রায় দুই ইঞ্চি কেটে মাউথপীস করা হয়। যে বাজায় সে হয় বসে বজায় নয়ত ডান হাতের কব্জিটি মাটির উপর স্থাপন করে অর্ধশায়িত অবস্থায় বাজায়। হয় হাতের তালু নয় বাম হাতের একটি আঙুল দিয়ে চোড়া কিনায় তুলে ধরে, এবং তার ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে ছোট শেষ প্রান্তটি খুলে এবং বন্ধ করে। এতে মাউথপীস দিয়ে একটি অতি সুন্দর সুরের সৃষ্টি করে।

এই যন্ত্রটি যুবকদের অতি প্রিয়। তারা সোরাং-এ থাকাকালীন এর মধুর শব্দ সহযোগে তাদের প্রেমিকার নাম ধরে ডাকত।

এ রকম করায় কেউ কোনো অপরাধ বলে একে গণ্য করত না। ৮

এদের যত ক'টি সামাজিক অনুষ্ঠান আছে তার সবগুলিই যাদু ক্রিয়ার অন্তর্গত। সামাজিক অনুষ্ঠানও অজস্র। এরা spirits-এ ভীষণ ভাবে

বিশ্বাসী। যাই হোক প্রায় প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গে সংগীত নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী ও পুরুষ যৌথভাবে নাচগান করে, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মেয়েরাই শুধু গানে অংশ নেয়, নাচ করে পুরুষেরা আবার মেয়েরাও বসন্ত উৎসবে নাচে।

আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি ফসল বপন, ঘরে আনা এবং ফসলের মাড়াই-কথাহীন সুরের প্রসঙ্গ, এবং সেই সুরের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের কথা।

লোক সংগীত ও মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে গ্রহণ ও বর্জনের কাজ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলছে। অনার্যভাষী মানুষদের সংগীত আর্যভাষী মানুষদের সংগীতকে প্রভাবিত করেছে। ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী একজন বিশিষ্ট সংগীত বিশারদ ও গবেষক, তিনি তাঁর ভারতীয় সংগীতের কথায় বলেছেন, "আজও ভারতের বিভিন্ন অংশে আদিবাসীদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য-গীতের প্রচলন আছে তার সবটাই যে আর্যদের কাছে ধার করা এ কথা মনে করবার কারণ নেই। আর্য ও অনার্য সংগীতেরও মিশ্রণ ঘটেছে।" (পৃঃ ৯) মতঙ্গের কথা আগেই উল্লেখিত হলেও তিনি সুর সম্বন্ধে যে অভিমত তাঁর 'বৃহদ্দেশীয়' বইতে লিখেছেন তা বলা হয়নি। মতঙ্গ বলছেন: "চতুঃস্বারৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ শবর পুলিন্দ কম্বোজ বঙ্গ কিরাত বাহ্লীকান্ধ্রদ্রাবিনাড়াদিষু প্রযুজ্যতে।" অর্থাৎ "এক স্বর থেকে চার স্বরযুক্ত গানগুলি মার্গশ্রেণীভুক্ত নয়, পরন্তু দেশী, শবর, পুলিন্দ, কম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে চারস্বরে যুক্ত গানের প্রচলন ছিল।"

অধ্যাপক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমতও অনুরূপ। তিনিও বলেছেন, "ভারতীয় সংগীতের আলোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের আর্য সংগীত অনার্য জাতির নানা দেশওরালি বা দেশী সংগীত থেকে প্রচুর পরিমাণে উপাদান সংগ্রহ করে তার বৃহৎ কলেবর পুষ্ট করেছে।"

নাগারাও আদিবাসী অনার্য সমাজভুক্ত। কিন্তু এদের গান নিয়ে কাকেও কোনো আলোচনা করতে দেখিনি। শুধু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর লোক-সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন নাগাদের কোনো লোক সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি, কারণ হিসাবে বলেছেন এরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বাইরের কোনো ভাবধারাকেই অঙ্গীকৃত করতে ইচ্ছুক নয়।১০

এরা রক্ষণশীল ঠিকই, কিন্তু লোক সাহিত্য এদের নেই, এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। এদের লোক কথার এক বিরাট ভাণ্ডার আছে, এখনো সব আবিষ্কৃত হয়নি, নৃতাত্ত্বিকদের কল্যাণে যা পাওয়া গেছে তাও কম নয়। এদের জীবনের

অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে নির্দয় প্রকৃতির সংগে লড়াই করে, কিন্তু প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, বরং প্রকৃতিকে পরাভূত করেছে। লোককথাগুলি মানুষের বিজয়েরই সজীব কাহিনী।

ইতিমধ্যেই আয়তন দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায়, এবার শুধু গানগুলি উল্লেখ করব।

পূর্বেই এদের কৃষি কাজের উল্লেখ করেছি। জংগল পরিষ্কার করে যেমন এদের বসতি স্থাপন করতে হয়, তেমনি জংগল সাফ করেই চাষের ক্ষেতও করতে হয়, তবে বড়ো বড়ো বৃক্ষগুলি কাটে না, তাদের শাখা প্রশাখা শুধু ছেঁটে দেয়।

এই নিয়ে লোথা নাগারা এই গানটি করে :

হয়ত হবে ছোট পাখির দাঁড়
　　যে গাছটি কাটছি তার 'পরে
হয়ত সেথা বসে হর্নবিল
　　যে গাছটি কাটছি আমার তরে।

যে গাছটি কাটছি আমি
　　হয়ত দাঁড় মোরগ রাজা কাকের
যে গাছটি পড়ছে কাটা আজ,
　　জন্ম হোক 'টেরো' আনাজের

যে উঠতে পারে শীর্ষে বিটপীর
　　সেই যে হয় 'মধুর' মালিক জেনো
গাছের 'পরেই' বাড়ে 'মধু'
　　এ কথাটি সত্য বলে মেনো।

২

লোথা নাগা মায়েরা ক্রন্দনরত সন্তানকে গান গেয়ে শান্ত করেন নানা কথা বলে। নীচের গানটিতে একটি বিধবা তাঁর সন্তানকে ভোলাচ্ছেন।

ওরে আমার খোকন এত কাঁদিস কেন
　　'মধু' খাবার তরে বুঝি কান্না
ভালো করে রেখেছি যে মধু
　　দিব তাই, তোর কান্না থামা না।

১, মদ, এরা এই মদ প্রধানত দু বার পান করেন, এক বার খাবারের সময় আর একবার দিনে দুটি আহারের মধ্যবর্তী কালে।

ওরে আমার ছোট্ট খোকন
ওরে বাছা ধন আমার
অত ক'রে কাঁদিস কেন ছেলে
একটুখানি লক্ষণ নেই থামার।

এমন ভাবে কাঁদিস যদি তুই
মৃতের মাঝে বীর বাবা যে তোর
ফিরে সে আসবে নারে হেথা
ডাকবে না, দিবে না ত কোল।

তাইত বলি খোকন
চুপ কর বাছাধন।

৩

ম্যালেরিয়ার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ছিল নাগা অঞ্চলে। এই ম্যালেরিয়ায় বহু লোক মারা যেত, এবং এরই কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে নূতন বসতি গড়ত—নূতন গ্রামের হত পত্তন। তবে, নূতন গ্রাম পত্তনের পূর্বে, স্থান নির্বাচন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেখা হত সেই স্থানে জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা আছে কি নেই, এবং দ্বিতীয়টি ছিল, প্রধান বৃক্ষ (Head Tree) আছে না নেই! এই দুটি জিনিস যেখানে লভ্য সেইখানেই নূতন গ্রামের পত্তন হত। এখানে Head Tree বিষয়টির সংগে একটি কিংবদন্তী মিশে আছে। কিংবদন্তীটি এইরূপ:

এক সময় একজনের একটি শূকার ছিল। একদিন শূকরটি চরতে গিয়ে আর ফিরে না আসায়, শূকরির মালিক শূকরিটির খোঁজে বেরোয়। পাহাড় অঞ্চলে খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায় শূকরিটি নিশ্চিন্তে একটি বড়ো গাছের তলায় তৃণাচ্ছাদিত অংশে শুয়ে আছে। সেই ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ স্থির করে যে সেইখানেই সে নূতন বসতি গড়ে তুলবে।

পরবর্তীকালে এটিই একটি সংস্কারে দাঁড়ায়।

শুধু Head Tree বাছলেই হবে না। যে স্থানে নূতন গ্রামের পত্তন হবে তা শুভ না অশুভ হবে, তার জন্যেও একটি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করতে হয়। সেটি হলো এই:

নূতন গ্রাম পত্তন করার পূর্বে একজন ঐ স্থানের একটি ঝোপের একটি ডাল কাটবে এক কোপে; এমন সতর্কভাবে কাটতে হবে, যাতে ডালে একটি পাতাও মাটিতে না পড়ে। মাটিতে পাতা পড়লে তা অশুভ লক্ষণ সূচিত হয়, সেক্ষেত্রে

আবার নতুন স্থান নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্থান নির্বাচন পর্ব শেষ হলে একজন পুরোহিত নির্বাচন করে বাকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি করা হয়। এতেও আছে বহু যাদু ক্রিয়া।

নীচের গানটি এমনি একটি নূতন গ্রাম পত্তনের গান। কোনো এক ব্যক্তি উক্ত গ্রাম ত্যাগ ক'রে জাপফুতে নূতন গ্রাম পত্তন করে, তখন অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। অনেকে যেতেও চায়নি, এবং কি কি ঘটনা ঘটেছিল, তারই বর্ণনা আছে গানটিতে :

হো একটি নূতন গ্রাম
জাপযু তার নাম
পিখাং গো পত্তন করতে চায়
হো মতলব তার টের পেয়ে
পুরোনো গাঁয়ের রেণে-উ যে
দিচ্ছে বাধা কেউ যাতে না যায়।
হো সিরেনখ্যাং এর হয় মস্ত ভুঁড়ি
ঠিক যেন কাঠ বইবার ঝুড়ি
সেও গেল চলে নূতন গাঁয়
হো জোয়োসেকেঙ রাখা গেল না
সেও গেল, 'না' বললো না
একে একে সবাই চলে যায়!
হো কোপ্পিযুক্ত এক বৃদ্ধজন
পরিকল্পনার গর্তে কখন
ঢুকে পড়ে, খড়ের মধ্যে গুবরে যেমন ঢুকে
হো অরণ্যেতে করতে বাস
দানো কাছিমের অভিলাষ
অরণ্যকে, ভালবাসার সুখে।
হো দানো কচ্ছপের মত
সেও ভালোবাসে কত
সে অরণ্য গভীর যদি হয়
হো তোমরা চারিজন কি
গুড়ি মেরে উঠবে নাকি
অতি উচ্চে যে জাপযু রয়।
হো বিসামো লাল ফুলের মত

রেসালার চোখে সুন্দর কত
যে ফল হয় কর্ণের ভূষণ
হো পেনোর নেই যৌবন আর
বিবর্ণ ফুল কানে গোঁজার
উত্তম লাগে দূর দরশণ।
হো রেসালি যে ভাল মেয়ে
গভীর প্রেম তার হৃদয়ে—
সংগোপনে রেখেছিল অতি
হো সেই প্রেম সে দিবে যাকে
সে কি ভালোবাসে তাকে
বেসমিব, বোঝেন না যে মতি ?
হো মুগীর ছানা যেমন হয়—
কেশ যার নাহি রয়
ইয়ানচানা তেমনি এক জন
হো বেয়োর কুশ্রী চুল বাঁকা
যেন মহীষের কপালে থাকা
তেল বীজের নিংড়ানো বরণ।
হো সেনসেলো সুন্দরী নারী
কিফুং বংশে নাম ভারী
সুখেই ছিল স্বামীর ঘরে সে
হো মাংসাসো নাম যার
মৃগ সম তৎপর
ছিল শোনো ফিকাং বংশে।
হো সেনসোলোকে চুরি ক'রে
মাংস রানে ঘরে
শুনাতা বিরাজে স্বামী ঘরে
হো বল দেখি কি হত আর
টাকা যদি জারিমানার—
তুলে দিতে পারত আপন করে।
হো সেনসোলোকে প্রেম নয়
অর্থ প্রিয় অতিশয়
ডুবে আছো নিজে টাকার মায়ায়।

হো বন্ধু তুমি মূল্যহীনা হায়,
স্ত্রী রূপে সে চায়নি তোমায়
তার ঘরে কি দিয়েছে কাজ?
হো নও পরিণীতা তার
তাই নেই ত অধিকার
বৃথা তোমার গায়ে স্ত্রীর সাজ।

৪

১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লোথা নাগাদের নিয়ে যাওয়া হয় সৈন্য করে বিশেষভাবে কুলির কাজ করার জন্য। এরা ছিল ফ্রান্সে। এই নিয়ে একটি গান রচিত হয়। গানটির প্রথমাংশ নাগাভূমির মোকোচাং মহকুমার শাসক ছিলেন, সেই হট্টন সাহেবকে উদ্দেশ করে বলা
দ্বিতীয়াংশে যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে।

হটন্ সাহেব ও বিদেশী তরুণ
এত ত্বরিত কি বারতা আসে
জার্মান যুদ্ধ লেগেছে বিদেশে
যুদ্ধে মোরা যাব কি প্রবাসে।

দেখ দেখ প্রতি গ্রামে আজ
সকল যুগ-বন্ধুদের এক সাথে
করছে পরামর্শ সবে দেখ
টগবগিয়ে যুদ্ধে যাবার উল্লাসে।

জার্মান যুদ্ধে যাব মোবা নিশ্চিত
চিঠির ভাষা হবে না নিস্ফল
পর্বতের মানুষ মোরা জান তা
আমরা যুগ অতি যে চঞ্চল।

এবার ফিরে আসার উচ্ছাস—

আমরা শেষ করেছি তাদের
শত্রু যারা ছিল সাহেবদের
এবার ফিরতে দাও ত্বরা ক'রে
নির্ভিক এই পাহাড়িয়াদের।

ঘরে মোদের মেয়েরা সব শুনুক
শুনুক খবর মোদের বীরত্বের
শুনুক তারা,আমরা সবাই
শেষ করেছি শত্রু সাহেবদের।

মোরা নির্ভীক পাহাড়িয়া জাতি
বিদেশ থেকে আমরা আসছি ফিরে,
আমাদের নারীদের দাও সংবাদ
যারা দিন গুনছে থেকে গাঁয়ের ঘরে।

মোদের সাথে মিলুক তারা এখন
সবাই 'মধু' হাতে হাতে নিয়ে
বল তাদের দেখা করতে মোদের সাথে
ঘরে যাবার মাঝ পথে গিয়ে।

মোদের দু জন সাহেবকে
বল গিয়ে অতি সত্বর
ঘরে অধীর হয়ে আছে যারা
পাঠিয়ে দিক মোদের ফেরার খবর।

কোনিয়াক নাগাদের কয়েকটি গান

Songs are the principal and recognised medium through which the individual as well as the group express their most intense emotion. [১১]

হোইসড্রুফ জানাচ্ছেন কোনিয়াক নাগাদের খুব ছোট বেলা থেকেই গান শিক্ষা দেওয়া হয়। এ কাজ করে মোরাং এর যারা পুরোনো সভ্য তারাই।[১২] এর থেকেই বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে সংগীত এরা কত ভালোবাসে, বলা যায় সংগীত এদের জীবনের অপরিহার্য অংশ রূপেই স্থান করে নিয়েছে। প্রত্যেক উৎসবে, নৃত্য ও গীত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রতিটি গ্র্যান্ড-ফিস্ট* এ সংগীতের অনুষ্ঠান হবেই। আমাদের চোখে হয়ত বিসদৃশ

* নাগাদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা বছরে একবার ত-বটেই গ্রামের এবং পাশের গ্রামের মানুষদের ভুরি ভোজন করায়।

ঠেকবে, কিন্তু কোনিয়াক নাগাদের যৌন-জীবন কিছুটা শিথিল। যাই হোক, নর-নারীর ভালোবাসার মধ্যে কোনো খাদ নেই। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা সমাজের চোখে গর্হিত নয়, এমন কি অন্যের বিবাহিত স্ত্রীর সংগে অবৈধ প্রেম দোষনীয় বলে গ্রাহ্য হয় না। যেক্ষেত্রে এই ঘটনা এমন একটা পর্যায়ে যায় যা পরিবার বা সমাজের মর্যাদা হানিকর সেই ক্ষেত্রে পুরুষকেই দন্ড ভোগ করতে হয়।

প্রত্যেক রাত্রিতে ছেলেরা অবিবাহিত মেয়েদের শয়নাগারে (Dormitory) যায় সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত তারা গান গায় ও বন্ধু সুলভ আলাপ করে। এমন কি আট দশ বছরের বালকেরাও সেখানে যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই তাদের নিজেদের মোরাং এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বড়োরা গভীর রাত পর্যন্ত থাকে। এমন কি প্রেমিক প্রেমিকার সাথে মিলনের জন্য গ্রামের বাইরে শস্যাগারে যায়।

সন্ধ্যা নামার প্রাক্‌কালে যুবক এবং যুবতীরা মাঠের কাজ শেষ করে ফিরে এলে গ্রামের প্রবেশ পথেই, একটি উঁচু মঞ্চ করা হয়। সেইখানে তারা মিলিত হয়, এবং ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে একে অন্যের গায়ে পড়ার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। এবং এই অবস্থায় তারা গান গায়, কখনো ছেলে গায়, কখনো গায় মেয়ে। গানের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরও চলে। এ সব গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৎক্ষণাৎ রচিত হয়।

এই সব গানে প্রধানত দেখা যায়, কখনো ভাবপ্রবণতা, কখনো কৌতুক কখনো আবার ঠাট্টা ইয়ার্কি। কোনো কোনো গানে সোজাসুজি কোনিয়াকের প্রাত্যহিক জীবনের কথাই স্থান পায়।

এমনি একটি গান নিচে দেওয়া হলো :

১

চল যাই ফিরে এবার গ্রামে
কুমারী বধুদের ঘরে
সেথায় তারা আছে অপেক্ষায়
মোদের সংগ পাবার তরে,
ক্ষুধায় কাতর নই ত মোরা
খাদ্য তাও চাহি নাই
ক্ষতি নেই, নেই চিন্তা মোদের
যদি পানীয় নাহি পাই,

চাই শুধু মোরা ভালোবাসা
তাই শুধু প্রেমের আকর্ষণে
পায়ে হেঁটেই করি আসা যাওয়া
ক্লান্তি তো নেই দেহ ও মনে।

২

একটি গ্রামের প্রবেশ পথের কাছেই যে মোরাং থাকে, সেই মোরাং এর ছেলেরাই প্রাত্যহিক অন্য এক মোরাং দলের মেয়েদের শয়ন কক্ষে যায়, কোনো কোনো সময় দেখা যায় অন্য গ্রামের ছেলেরা মেয়েদের আস্তানায় এসে থাকে এমন কুমারী মেয়েরা তাদের সাদরে গ্রহণও করে। এই দৃশ্যে স্বভাবতঃই গ্রামের মোরাং এর ছেলেরা দুঃখ পায়, কিন্তু যেহেতু অন্য গ্রামের মোরাং এর ছেলেরা শক্তিমান সেই জন্য নীরবেই তারা ফিরে যায়। অন্তরের দুঃখ বেদনা নিচের গানটিতে ধরা আছে।

বেন বৃক্ষের শাখায় যেন লাল বেরী,
তেমনি শোভে সখীরা মোদের
আসে কত প্রাণী কত যে সজারু
খেয়ে যায় গাছের বেরীদের।
ডিকহু উপত্যকা, আরো দূর গ্রাম থেকে
ছোট বড়ো হর্নবিল আসি,
খেয়ে যায় লাল বেরী সব
বিটপীর উচ্চ শাখে বসি।
আমাদের মোরাং এর ছেলে মোরা
মোরা হলাম ইউকি পাখির ন্যায়
যবে আসি দেখি চেয়ে ফলহীন,
ছাল তোলা বৃক্ষের শাখায়।
শূন্য হেরি নগ্ন বৃক্ষ শাখা
ভেঙে যায় হৃদয় মোদের
ব্যর্থ প্রেম, ব্যর্থ ভালোবাসা
আছে শুধু কান্না হৃদয়ের।

৩

কখনো কখনো প্রেমিক যুবকরা আপন আপন প্রেমিকার কোমরে হাত রেখে গান শোনায়। যার সংগে তার বিবাহের কথা বার্তা চলছে। এমনি একটি গান উল্লেখিত হলো :

পুরুষ— ওগো বালা অন্য মোরাং এর
ওগো মোদের প্রিয় বান্ধবী
তোমরা ধনী মাতৃ ধনে, জানি
আছে অর্থ রত্ন সবই।
তোমাদের পতির হাতে নেইতো ধন
যদি থাকে তাও আকিঞ্চন,
তাই বলে যে করবে নাক হেলা
জানি তাহা জানি।

তোমাদের দেহের সৌন্দর্য ধন
তা রবে না সারা জীবন
কালের স্রোতে যাবে তারা ভেসে
যবে হবে জননী।

তাই তো করি আবেদন
দিয়ে তব যৌবন ধন
অভিষিক্ত করবে যৌবনের
জানি তাহা জানি।

নারীর উক্তি—

যখন তুমি আমার সংগে থাকো
চোখের জলে বুক ভিজিয়ে রাখো'
যখন থাকো আপন পত্নী সনে
চপল হাসি হাসো অকারণে,
বল কেন আপন বধু ছাড়ি
আমার কাছে নিত্য দাও পাড়ি ?
জানি, যৌবনেরই সহচরীর চেয়ে
প্রিয় তোমার বিবাহিতা মেয়ে।

৪

কোনিয়াক নাগাদের ছেলেরা যখন সন্ধ্যায় আগুনের চারিপাশে বসে তাপ নেয়, কিম্বা মাঠ থেকে সন্ধ্যায় ফেরার সময়, তারা নিচের গানটি গায়। এই গানটির সঙ্গে বাঁশের বাঁশীও বাজে।

রাত্রি নামে যবে,
নিদ্রার সময় হবে
মোর মোরাং-এর শয্যা দেয় ডাক,
খোঁজ করি বার বার
পরিচিত শয্যার—
যেথা থাকি নিদ্রায় নির্বাক।

৫

আরো এক ধরনের গান এরা গায়, যে গান ছেলে থেকে যোদ্ধারাও যোগদান করে। প্রত্যেকের হাতে থাকে দাও। গানের ছন্দের সঙ্গে তালে তালে সবাই নাচে। নাচের সময় মাঝে মাঝে হাঁটু বাঁকায়। গানটি তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৌরাণিক শৌর্যবীর্যের কথায় ভরা। ওয়েকুচিকের (Oukheang) মোরাং দাবি করে তাদের মোরাংই সর্ব প্রাচীন। তারা তাদের গানে প্রশংসা করে ও ইয়ানা এবং শেওয়েং সন্তানদের যারা নাকি তাদের পূর্ব পুরুষ।

হয়ং-সয়ম-আউ-ইউ প্রথম আসে এ ধারায়
যখন ধরা ছিল পূর্ণ মাটি জল ও শিলায়,
হোক তাদের সন্তানরা শক্ত স্বাস্থ্যবান
একই সাথে মিলে মিশে করুক অবস্থান।

ও মানুষ আর ব্যাঘ্র, ভাইয়েরই সন্তান
বুনো শুয়োরের মাংস দোঁহে খেয়েছিল সমান।

আকাশেতে তারা থাকে, সূর্য ওঠে ওই আকাশে
দীপ্তি ছাড়ায় পৃথিবীতে, আলো করে দান
তেমনি উচ্চে আসীন থাকবে তারা
যারা ইয়ানা ও শেওয়েং এর সন্তান।

সুউচ্চ বৃক্ষের ন্যায়, কুমারী বনের মত—
ও ইয়ানা ও শেওয়েং এর সব সন্তান,
তেমনি মহান তারা, তারা গরীয়ান
পৃথিবীতে নেই কেউ তাদের সমান।
অন্ধকার ছিন্ন করে বিদ্যুতের চাবুক,
নামায় বর্ষণ, ভিজেই লাউ স্রোতে যায় মিশে
বজ্রের গর্জন শ্রুত হয় ঘন ঘন
তোমরাও সেই মত শক্তিমান এ দেশে।
পেটা ঘড়ি যেমন তোলে প্রতিধ্বনি
তেমনি চলো ইয়ানা ও শাওয়েং এর সন্তান
ও ইয়ানা ও শাওয়েং এর সন্তান নও দুর্বল,
এমনি তাদের মহত্ত্ব ক্ষমতা ও সম্মান।

সন্তান সন্ততি সব তাদের,
পূর্ণ করুক সম্পদ গ্রামের।

৬

কোনিয়াক নাগারা যেমন গানে তারা নিজেদের মোরাং এর প্রশংসা করে যখন সমবেত ভাবে তারা নৃত্য করে, ঠিক তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী মোরাং এর স্তূপীকৃত শস্য দেখে আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। নিচের গানটিতে ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় বর্ণিত হয়েছে বালাং মোরাং এর দ্বারা। বালাং মোরাং বাইরে যারা বিয়ে করে, তাদের বিপরীত গোষ্ঠী। বালাং মোরাং এর এই গোষ্ঠীটিকে, Oukheang এবং Thepong মোরাং গঠন করেছিল। শেষের দুটি মোরাংকে ঠাট্টা করে গানটি গীত হয়।

সব গ্রাম থেকে সেরা গ্রাম ওয়েচিং
কানের গঠন দিয়ে
কানের পর্দা দিয়ে
শোনো, আমাদের গান শোনো
ও গ্রামবাসী, ও সাধারণ মানুষ
ও সর্দার, শোনো আমাদের গান।
কুকুরের মতো তোমার কান কর খাড়া—
কুকুরের মতো লম্বা লম্বা কান।

ওই সাধারণ লোকগুলি করেছে মতলব
আমাদের গ্রামকে করতে ধ্বংস
কি কাজ তারা করছে ?
গ্রামের মোড়ের উপর
রাবার গাছের কাছে
তারা শপথ নিচ্ছে মোরাং এ
কোঙানদের একলা দেখে তারা,
তবু তারা লড়াই-এ প্রস্তুত
যখন ফেই ওয়াং নদী বয়
তোমার মায়ের যে হাত দিয়ে
তোমায় নিয়ে যেত তার কোলে
সেই হাতের খোঁজ কর সবে
তুলে নাও হাত তাকের মত মাথার উপর
হাত তুলে কাঁদ আর ডাক তোমাদের মা'দের।
ওই সব গ্রাম ধ্বংসকারী
কি কাজ করেছে তারা ?

এই গানটি Oukheang এবং শেপং মোরাং এর লোকেরা যে Kongan গ্রামের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে নিষ্ফল হয়েছিল তার বর্ণনা আছে, লুণ্ঠনকারী দলকে সাধারণ বলা হয়েছে।

গান এবং নাচ বিষয়ে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। এক মোরাংএর গান নাচ যদি অন্য মোরাং করে থাকে তবে দেখা গেছে দুটি মোরাং এর মধ্যে স্বত্ত্ব নিয়ে ঝগড়া তো হয়ই এমনকি খুনোখুনিও হয়।

এরা যেমন ঐতিহ্যবাহী গানগুলি গায় তেমনি আবার নূতন গান রচনা করে গাইতে থাকে। গান গাইবার সময় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় দেশাত্মবোধ দ্বারা এরা উদ্বুদ্ধ হয়। গান এবং নাচ এদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

গানের ক্ষেত্রে প্রেম সঙ্গীত এক মোরাং এর সৃষ্ট হলেও এই গান প্রতিটি মোরাংই গাইতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে ঝগড়া কোন্দল হয় না। এই সব গানকে কোনিয়াক নাগাদের সব মোরাংএরই সম্পদ বলে গ্রহণ করার অধিকার থাকে।[১৩]

সূত্রপঞ্জী

1) Introduction of Lotha Nagas—by J. H. Hutton.
P XVI foot note.
2) ঐ P XXI
3) Lotha Nagas—by J. P. Hill P 3
4) Introduction—by J. H. Hutton P XVI & XVII
5) Lotha Nagas—by J. P. Hill P 4
6) Folk Music and Folklore Institute—An Anthology Vol. I —by Folk Music & Folklore Research Institute. P 126
7) Introduction—J. H. H. P XI & XII
8) Naked Nagas—by Furer Haimendorf P 54-55
9) Lotha Nagas—by J. P. Hill P 88-89
10) বাংলার লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ২
11) Naked Nagas—by F. H. P 211
12) ঐ
13) ঐ P 220

এঙ্গেলসের ফোকলোর চর্চা

লোক-সংস্কৃতির যত বেশি অ্যাকাডেমিক আলোচনা হয়েছে, তত বেশি মার্কসীয় দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা হয়নি, অথচ মার্কসীয় দৃষ্টি দিয়ে লোক সংস্কৃতির আলোচনা না করলে, সমাজ বিকাশের অনেকখানি ইতিহাসই অজ্ঞাত থেকে যায়। সেই জন্যই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজের বিকাশ ঘটে, শ্রেণী সংগ্রামের পূর্ব অধ্যায়ে মানুষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামের কালেও সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বেদনা দ্বন্দ্ব সংগ্রাম সামাজিক অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কখনো সরাসরি, কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপের ছলে তা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ কী অতীতে কী এখনো মাথা পেতে অন্যায় অবিচারকে মেনে নেয় নি। তাই মার্কসীয় দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করলে, শুধু অ্যাকাডেমিক আলোচনায়, যাঁরা আজও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সৈনিক তেমন উপকার পাবেন বলে মনে হয় না।

স্বয়ং মার্কস এবং তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু এঙ্গেলস Folkloreকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পরে এই বিষয়ে আসছি।

আধুনিক কালে এবং প্রাচীন কালেও দুই প্রকৃতির সংস্কৃতি পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে; একটি শিষ্ট সংস্কৃতি, অপরটি লোকসংস্কৃতি। ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করলে, নিশ্চয়ই বলতে হবে লোক সংস্কৃতি অনেকখানি বিরাজ করছে আজও। যাঁরা শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে মগ্ন, তাঁরাও যে লোক-সংস্কৃতির মূল্যবান দিকগুলি পরিহার করেছেন তাতো নয়ই বরং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কালের সাহিত্য স্রষ্টারা কোনো না কোনোভাবে লোক সংস্কৃতিকে তাঁদের সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। যে-কোনো জাতির নিজের ভাষাটি কি তা জানতে হলে লোক সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের মনোনিবেশ করতেই হবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকেই তুলে দিচ্ছি।

> "যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।" ব্যক্তি বিশেষের জীবনে ইহা যেমন সত্য, জাতির জীবনেও তাহা তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে, "বাঙ্গালী জাতির

প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভালো জানি না। আধুনিক বাঙলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না।...এখনো আমরা বাঙালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই।...সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজী ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।" ..."ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুধু জ্ঞানের প্রতিরূপ নির্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ-দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটি নির্জীব প্রতিমা করা যাইতে পারে না। ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণভাবের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ এই সব যুক্তি দেখাইয়া 'সঙ্গীত সংগ্রহ' সামান্য একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য দেখাইলেন। আধুনিক কবিরা প্রেমের কবিতা বিরহের কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সে আন্তরিকতা নাই, যাহা এই লোক সাহিত্য সংগ্রহের কবিতায় দেখা যায়। ইহার কারণ তরুণ লেখক এখনো স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সারার্থ হইতেছে, লোক সাহিত্য সেই সাধারণ লোকেই সৃষ্টি করে যাহার ভাবধারার সহিত দেশের নাড়ীর বন্ধনযোগ ছিন্ন হয় নাই যাহার ভাষা ইংরেজির অনুকরণে বিকৃত হয় নাই। "ইহাকে দেখিলেই এমন আত্মীয় বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই।" এই প্রবন্ধে তিনি সর্বপ্রথম বাঙালীকে এই দেশীয় গান কবিতা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।১ কবির এই আহ্বান বিফলে যায় নি, তা আমরা সবাই জানি। রবীন্দ্রনাথের কালে এবং বস্তুত বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা আলোচনা সেমিনার সম্মেলন চলত। এই বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে পরে শুরু হয়। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এই নবাগত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন অনুশীলন গবেষণার বাধাগুলি ধীরে দূরীভূত হচ্ছে। লোক-সংস্কৃতির চর্চা এবং একে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ করা, শুধু নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের বা লোক-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্রদেরই অধীতব্য বিষয়। মার্কসবাদে যাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত, তাঁদেরও লোক-সংস্কৃতি শাস্ত্রে

সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত, কেননা রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত অভিমত থেকেই বোঝা যায়, লোক-সংস্কৃতি ফসিল নয়। তার প্রাণ আছে, সে স্থবির নয়, সচল। বিশেষ কোনো এক জাতির লোক-সাহিত্য বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সেই জাতির লোক-সাহিত্যেরই প্রশংসা করেছেন তা নয়, উনি সেই সাহিত্যের মধ্যে সেই জাতির লোক সমাজের মানস ও হৃদয়াবেগের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াও আবিষ্কার করেছিলেন। নিজেদের অতীত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া এবং অবহিত হয়ে তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তাকে যুগের উপযোগী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জাতির কর্তব্য।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমাজজীবনকে জানতে হলে, তার ক্রমবিকাশের ধারাটিকে বুঝতে হ'লে এবং বিশেষ কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে নিয়োজিত করতে হলে এবং সেই মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত করতে হলেও, লোক সাধারণের কৃতির মধ্যেই জানা যায় এবং আপনার নৈকট্যে নিয়ে আসা সহজ হয়। কেননা—

> Culture is a specific attribute of Society that reflects the level of historical development achieved by man and determined the relationship to nature and society. [২]

এই সংগে লেনিনের কথাও মনে রাখতে হবে। যে কোনো শ্রেণী সমাজে সংস্কৃতিতেও শ্রেণী চরিত্র বিলুপ্ত হয় না, তা বর্তমান থাকে।

> In any class society culture assumes a class character both to its class ideological content and its practical aim. [৩]

মহান দার্শনিক মার্কসের পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা পৃথিবীকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যার সংগে মার্কসের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের দার্শনিকগণ দেহতত্ত্ববাদী ও অধ্যাত্মবাদীদের পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা দেহতত্ত্ববাদ বা অধ্যাত্মবাদকে গর্হিত বিবেচনায় তাকে পরিহার করে, কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাই—

"আমাদের দর্শনের ইতিহাস প্রায় একান্তভাবেই সম্প্রদায়গত। কেন না, কোনো এক সুদূর অতীতে কয়েকটি মূল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবার পর পরবর্তী কালের দার্শনিকতা বলতে প্রধানত সেগুলিরই বিকাশ। অর্থাৎ, আমাদের দেশে যুগের পর যুগ একের পর এক নূতন ও স্বাধীন মতবাদের আবির্ভাব হয় নি ...... । একের পর এক দার্শনিক অবশ্যই এসেছেন; কিন্তু তাঁরা অন্তত সচেতনভাবে কোন নিজস্ব নূতন মত প্রস্তাব করতে সম্মত নন। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, অতএব হয়ত নূতন করে

পুরানো কথাগুলিরই সমর্থন করেছেন। তাই চিন্তার মূল কাঠামোগুলি একই থেকেছে, দাশগুপ্ত* যেমন বলছেন, the types remained the same. ৪

মার্কসই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাঁর পূর্বসূরী দার্শনিকদের যত কিছু ব্যাখ্যাকে আঘাত করে বললেন, পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করাই দার্শনিকের কাজ নয়, একে পরিবর্তন করাই হলো কর্তব্য।

The Philosophers have only interpreted the World in various ways, the point, however, is to change it. ৫

এই উদ্দেশ্যে তিনি Folklore-কেও পরিত্যাগ করেন নি। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় সাহিত্য, আইন ও শিল্পের উপরিকাঠামো হলেও, এগুলি নিষ্ক্রিয় নয়, এগুলি আবার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর ক্রিয়া করে। Folklore এর ক্ষেত্রে বলা যায়, ইহা অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর তীব্র ক্রিয়াশীল।

দেশের সত্যকার ইতিহাস জানতে হলেও Folklore-এর আশ্রয় এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োজন আছে, যা শুধু ইতিহাসের বই পড়ে জানা যায় না।

The paramount importance of field work in the study of Indian history seems altogether to have escaped their (professional historians) attention. Such work in the field falls into three interrelated classes : archaeology, anthropology and philology. All three need some preliminary knowledge of local conditions, the ability to master local dialects and to confidence of tribes men as well as peasants. ৬

এংগেলসের চরিত্রে এই গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছিল। এংগেলস্ Folklore এর বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করেছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক শক্তিরূপেই।

এংগেলসের মধ্যে অনেক গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। স্কেচ অংকন বিদ্যায় তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার দিতে, তলোয়ার খেলতে বরফের উপর দিয়ে স্কেট্ করতে, তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। যাঁরা শীতকে ভয় করত বা শারীরিক দুর্বলতা দেখিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে এড়িয়ে যেত, তাঁদের তিনি ঘৃণা করতেন। এই গুণগুলির সংগে আরো একটি মহান গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি।

সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

Folklore-এর প্রতি তাঁর আগ্রহ বাল্য বয়স থেকেই দেখা যায়। এই আগ্রহ সৃষ্টি যিনি করেছিলেন, তিনি এঙ্গেলসের পিতামহ। অতি নিবিষ্ট মনে গভীর আগ্রহ সহকারে পিতামহের মুখ থেকে ফোকলোরের অন্তর্গত লোক কথাগুলি তিনি শুনতেন। এই লোক কথাগুলির মধ্যে, যে-সব কথায় বীরদের কার্যকলাপ উল্লেখিত হতো, বালক এঙ্গেলসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেই গুলিতেই।

> His grand father on the distaff side, Gerhard Bernhard Van Haar, a linguist........., and once rector of the Hamm Gymnasium who acquainted his inquisitive grandson with the myths of Ancient Greece and with German folklore, also had a beneficial influence on the boy. From him the boy learned of Theseus and the hundred-eyed Argus. Ariadne and the monster Minotaur, The Argonauts and their Search for the Golden Fleece and of the indomitable Heracles and of the persons ages of the German epics. Siegfried of the Nibelungenlied was the boy's favourite hero, a symbol of mainly exploits and the German youth's courageous stand against conservatism Philistinism and reaction. [৭]

উধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেলো, এই কারণে যে এঙ্গেলসের জীবনবৃত্তে যে ভাবধারা আবর্তিত হয়েছিল তাঁর বাল্য বয়সেই, তাঁর পরিণত বয়সে তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল্যায়নের সহায়ক হবে মনে করেছি।

এঙ্গেলসের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকজীবন, তাদের চেতনা-সংগ্রাম আচার আচরণ, অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করার পিপাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। এই কারণেই ফোকলোরের বিষয়ে তার আগ্রহের বৃদ্ধি ঘটে।

যৌবনে পদার্পণ করার সময়ে জনপ্রিয় (Popular) লোকগাথা এবং লোক কথাগুলি তিনি সংগ্রহ করেন এবং তা যথাস্থানে ব্যবহারও করেন। এখানে Popular শব্দটি ব্যবহার করার বিশেষ অর্থ আছে। এই Popular শব্দের অর্থ এঙ্গেলস যা করেছেন, তা হলো এই, অবশ্যই নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা শিল্প সংস্কৃতি বিষয়েই, তবু লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য মনে হয়েছে আমার, কেননা লোক সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়, তার রূপান্তরও ঘটে, আবার তা বিকৃত হয় অন্তত গানের ক্ষেত্রে।

Popular বলতে তিনি তাঁর যৌবনকালে যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হলো এই :

> In generally speaking the qualities which can fairly be demanded of a popular book are rich poetic content, robust humour, moral purity, ...we are also entitled to demand that it should be keeping with its age, or cease to be a book for the people.[৮] তিনি আবার অন্যত্র লিখেছেন যে Popular বই স্বাধীনতা অর্জনের সেবায় কাজ করবে, "but on no account should it encourage servility and toadying to the aristocracy or pietism".[৯]

এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে লোকসাধারণের অবস্থান শোষিত অত্যাচারিত বঞ্চিতের দলে। কাজেই তাদের ফোকলোরে শোষিত শ্রেণীর দুঃখবেদনা আশা আকাংক্ষা স্বপ্ন-কল্পনা, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংকলনেই কৃষক বিদ্রোহের উপর রচিত অনেকগুলি গান আমি তুলে দিয়েছি। যেখানে সরাসরি অত্যাচারী রাজা বা সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়নি, সেখানে কখনো টুনটুনি পাখির মুখ দিয়ে, পশুপাখির মুখ দিয়ে পরিকাহিনীতে অশুভ শক্তির পরাজয় দেখিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বহু অতীত যুগে মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপন করত, তখন প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর যে দলপতি সে ছিল সংঘ শক্তিরই প্রতীক। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে এমন অনেক বীরের কথা আছে যাদের কাছে দেবতাদেরও পরাজয় স্বীকার করতে হয়। লোক মানসেরই সৃষ্টি হারকিউলিস, প্রমেথিউস এসব বীর চরিত্র। মধ্যযুগে কৃষক অভ্যুত্থানগুলির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে স্পিগেল রবিনহুড, টিলউলেন। এমন কি আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারের প্রতিরোধে যে সব সাহসী বীর চরিত্রের বিবরণ পাই, তাদের বিদেশীর ইতিহাস ডাকাত দস্যু বলে বর্ণনা করেছে। রঘুকে বীর না বলে বলা হয়েছে ডাকাত। নীল বিদ্রোহের নেতা বিশুকেও বিশু ডাকাত বলেই আখ্যাত করা হয়েছে। এদের নিয়ে অনেক লোককথাও সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকাশধারার বিরাম নেই। এই যুগেও তা কোথাও তীব্রভাবে, কোথাও মৃদুভাবে হলেও, অত্যাচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লোকসংগীতগুলি সমৃদ্ধ।

এঙ্গেলসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল Folklore এবং জনপ্রিয় গান গল্প এবং কাহিনীগুলির প্রতি। এগুলিকে তিনি শুধু শিল্প হিসাবে দেখেন নি বা

রোমানস্টিক মতবাদীদের দৃষ্টি দিয়েও দেখেন নি। Folklore এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এই folkloreগুলি এই কারণেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এবং গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে এগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলির উৎপত্তি জীবন্ত জনগণের শিল্প চেতনায়, এবং এগুলি যে শোষণ বিরোধিতায় সমৃদ্ধ অভিব্যক্তি তাও আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করে মুদ্রিতও করেছেন :—

> Young Engels also liked folklore and popular tales. He collected legends in old editions. Studied the Colourful Speech of the Commoners and in imaginative literature appreciated those of its elements which it drew from the living source of the peoples' art. [১০]

এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। Folklore-এর চরিত্রকে বিকৃত করে যোশেফ ভন্ গোরেশ (Gorres) এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল রোমান্টিক লেখকরা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে এঙ্গেলস জার্মান Volks Bucher-এ একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন এবং তা ১৮৩৯-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

> Engels wrote an impassioned article, 'German Volks Bucher', printed in November 1839, against the reactionary romanticists (Josef Von Gorres and others) accusing them of distorting the nature of Folklore by presenting it as an embodiment of the "medieval spirit" and thus adopting it to the intesert of reaction. [১১]

মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের সাক্ষাৎ হয় ১৮৪৪ সালে প্যারিসে। সেই সময় থেকে তাঁদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেনিন folklore থেকে উদাহরণ টেনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> Old legends contains various moving instances of friendship. The European proletariate may say that its science was created by two scholars and fighters, whose relation to each other purposes the most moving stories of ancients about human friendship. [১২]

এই দৃঢ় বন্ধুত্ব শুধু যে সমাজ বিপ্লবের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তা নয়। এঙ্গেলস মার্কসের পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। মার্কসের

সুখ- দুঃখের একান্ত বিশ্বস্ত সংগী ছিলেন। মার্কসের ছেলে মেয়েরা এংগেলসকে 'কাকা' বলে ডাকতেন। এংগেলস মার্কসের পরিবারে গেলে সব থেকে খুশি হতো তাঁর ছেলেমেয়েরা। তাঁরা এংগেলসকে ছেঁকে ধরতেন fairy tale (পরি কাহিনী) শোনার জন্য। এংগেলস একটার পর একটা পরিকাহিনী বলে যেতেন। পরে এই পরি কাহিনীর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রথম রাশিয়াতেই হয়। এ কাজটি প্রথম করেন ভ্লাদিমির প্রপ। ওঁরই গবেষণা folklore-এর গবেষণার দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

এংগেলস্ folklore-এর সকল শাখাই সংগ্রহ করেছিলেন, সমাজ বিকাশের ধারা জেনেছিলেন, আবার এই ঐতিহ্য গ্রহণ করে সমাজ-পরিবর্তনের কাজেও লাগিয়েছিলেন।

মার্কসের সংগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হবার পর থেকেই দুই বন্ধুকে যে গুরুতর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়, তাতে অবসর মিলত খুব কম, তবু এই কাজের জন্যই জানতে হয় বিভিন্ন জাতি অধিজাতির সম্যক বিবরণ তাদের অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং মানস সম্পদ যেটিকে বলা হয় Super Structure—উপরিসৌধ।

অবসর কম মিললেও এংগেলস এরই ফাঁকে ফাঁকে Folklore-এর চর্চা করতেন। Folklore-এর প্রতি গভীর আকর্ষণ যে তাঁর ছিল তা তাঁর জীবনী থেকেই জানা যায়।

> Though Engels had very little leisure, he did not give up his academic pursuits, his interest ranged far—to literature, old German folklore, ancient worldly law, old English, the history of the ancient Garmans, their languages and dialects, Physics, Chemistry, Biology, Physiology, Geology and History of Economics. [১৩]

১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে Schwetizer Social Democrat Lassalleans-দের একটি পত্রিকায় মার্কস ও এংগেলসের নিকট লেখা চেয়ে পাঠালে ওঁরা লেখা দিতে স্বীকৃত হন। ১৮৬৫ সালে মার্কস এই কাগজে On Proudhon শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। এর সাথে সাথে এংগেলস, Lassall পন্থীরা কৃষকদের বিপ্লবী সত্তাকে যে অবজ্ঞা করত, তা যে সঠিক ছিল না তাই প্রমাণ করার জন্য একটি পুরাতন Danish folksong (ডেনিস লোক সংগীত) জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। সংগীতটি Herr Tidmann নামে পরিচিত। এই লোক সংগীতটির মধ্যে বিবৃত ছিল সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের বিরুদ্ধে

কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনী। এংগেলস্ এই লোকসংগীতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

The Song shows.........how the peasants humbled the Nobility's arrogance. In a country like Germany, where the propertied class contains as much feudal nobility as the bourgeoisie and where the proletariat contains as many or even more farm labourers than industrial worker—the zestful old peasant song will certainly be appropriate. [১৪]

এংগেলসকে এই সংগীতটি এত অভিভূত করেছিল যে তিনি মার্কসকেও এই সংগীতটি পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন একটি চিঠি। চিঠিটি তুলে দিচ্ছি—

Letter No. 73. Manchester 27th January 1865

I am sending this Chaps.* Social democrat, edited by Schweitzer the little Danish folk song about the Tidmann who is struck dead in the thing (Parliament by the old man because he lays new new taxes upon the peasants). This is revolutionary without being punishable and above all it is against the feudal autocracy, and the paper absolutely must come out against them. [১৫]

পরবর্তী অংশে লিখিত আছে—

The worthy Lassalle is being gradually unmasked as just a common rogue after all. [১৬]

এংগেলস Lassalle-র মতো সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটকে ঘায়েল করার জন্য লোক সংগীতের বৈপ্লবিক ব্যবহার করেছেন এটি হলো তারই উদাহরণ।

মহামতি এংগেলস গ্রামীণ সর্বহারাদের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংগে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিকতা ও Aristocracy-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, এই মহান দায়িত্ব পালন করবার জন্য তিনি বুঝেছিলেন, শুধু স্লোগান দিয়ে বা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে করা যাবে না! তাদের টেনে আনতে হলে তাদের সম্পূর্ণ জানতে হবে, জানতে হবে তাদের সংস্কৃতি-কেন্দ্র। গ্রামীণ সর্বহারাদের অন্তর তাদের সংস্কৃতির মধ্যেই বিরাজ করে, সেইখানেই তার পূর্ণ পরিচয়। এটা হলো পূর্ব শর্ত। তিনি সেই সময়ের জার্মানির সম্যক বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে পেঁছেছিলেন, তা ছিল এই—

In Germany struggle against feudal and bureaucratic reaction—for in our country the two are now inseparable—is synonimous to struggle for the spiritual and political

Social Dəmokrat edited by Schweitzer.

emancipation of the rural proletariat, and as long as the rural proletariat is not drawn into the movement, the city proletariat in Germany cannot and will not achieve the slightest success. To win the farm labourers to its side, he (Engels) pointed out, the city proletariat and its party must take a firm stand against the remnants of feudalism. [১৭]

একজন লোক-সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিকের যে বিষয়গুলি তাঁর গবেষণা কাজের সহায়ক বলে ধরা হয় তা হলো, যে অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গবেষণা সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের

১) জাতিতত্ত্ব, ২) ভৌগোলিক অবস্থা. ৩) ধর্ম-কর্ম-আচার-ব্যবহার, ৪) ভাষাতত্ত্ব, ৫) ঐতিহাসিক পটভূমি, ৬) সামাজিক পটভূমি, ৭) অর্থনৈতিক অবস্থা, ৮) জীবন যাপন পদ্ধতি, ৯) পরিবেশ প্রতিবেশ, ১০) রাজনৈতিক পটভূমি ইত্যাদি।

এংগেলসের জীবনী অধ্যয়নে জানতে পারা যায় এই সবকটিই গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

একটা বিষয়ের উল্লেখ করলেই তা জানা যাবে।

বৃটিশ শক্তি আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা অপহরণ করার পরও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন থেমে থাকেনি। ১৮৬৭ সালের আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ায় সিনফিনদের আন্দোলনকে বৃটিশ শক্তি পাশবিক অত্যাচারে দমন করার পরই আইরিশদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি মার্কস ও এংগেলসের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন কি মার্কস নিজে International-এ আইরিশদের স্বাধীনতার দাবি যে ন্যায্য, তা উত্থাপন করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনার কাজে এংগেলস আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আয়ারল্যান্ডে গিয়েওছিলেন। সেখানে বৃটিশ কি জঘন্য অত্যাচার করেছিল তার পূর্ণাংগ বিবরণ মার্কসকে চিঠির মারফত জানিয়েছিলেন।

এংগেলস তাঁর পরিকল্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, এবং ভেবেছিলেন এই তিনটি অংশে ইতিহাসটি লিখবেন। এই তিনটি অংশ হচ্ছে ১) প্রাচীন আয়ারল্যান্ড ২) প্রাকৃতিক অবস্থা (Natural condition) ৩) ইংরাজ বিজয় ও শাসন।

এই কাজ করার জন্য তিনি ঐ দেশে যান ১৮৬৯-এর সেপ্টেম্বরে। সংগে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা।

এংগেলস ল্যাটিন এবং স্কানডেনেভিয়ার ভাষা স্বচ্ছন্দেই পড়তে পারতেন, কিন্তু প্রাচীন আয়ারল্যান্ডের ভাষা তাঁর জানা ছিল না, সেই কারণে সম্যক উপলব্ধির জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাচীন আইরিশ ভাষা আয়ত্ত করে নেন। এরই সংগে সংগে আইরিশ জনগণের বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি যে কি পরিমাণ গবেষক ছিলেন তা জানতে হলে তাঁর সংগ্রহের উপকরণগুলির দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে।

The variety of the material he studied is astonishing—works on history, geography, economics and specially agriculture, the history of law, Ethnography, Philology and Folklore. Nor was he content with second hand information. He gathered materials with amazing thoroughness, checking the authenticity and trustworthyness, of every scrap of information. His list on Irish history contains more than 150 titles, the notes filled 15 Note books. ১৮

পরবর্তীকালে যখন তিনি The origin of Family, Private property and the State নামক গ্রন্থটি লেখেন, তখন সর্বাংশেই যে তিনি মরগ্যানকে অনুসরণ করেছিলেন তা নয়, এংগেলস অন্যান্য পন্ডিতবর্গের মধ্যে যাঁরা গবেষক তাঁদের প্রাচীন কাল্পনিক সাহিত্যগুলির দিকে মুখ ফিরিয়ে সেগুলির যথেষ্টভাবে ব্যবহার করতে আবেদন করেছিলেন বিশেষ করে হোমারের কবিতাও ফোকলোরের ব্যবহার করার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

Engels invoked the researchers of other scholars and made extensive use of available ancient imaginative literatures, including Homer's poem and of Folklore. ১৯

লোক সংস্কৃতি মৃত নয়—এটি একটি বিজ্ঞান, কাজেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ সব যুগেই করা যায়, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণায় প্রমাণ করেছেন Folklore নগর ও গ্রাম জীবনে বর্তমান এবং তা সজীব অবস্থায়। এই বিষয়ে অনেকেই Tradition-এর উল্লেখ করে অতীতের লোক-সংগীত ও লোক-কথাগুলিকেই স্বীকৃতি দেন। বিজ্ঞানের কাজ হলো ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোক-সংগীত ও লোককথাকে যুগের পরিবর্তনে সমৃদ্ধ করা। বুঝতে হবে Tradition কি।

............tradition is not a mere process which safeguards survival but in the true sense of the word a living force and

creative law.........we have seen, any way that a change in tradition does not mean that is living. [২০]

"যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়, ফলে ফোকলোরের চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে।"[২১]

এই উক্তির বৈজ্ঞানিক কারণ আছে—জীবন তা লোক জীবনই হোক বা পরিশীলিত নগর জীবনই হোক, তা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল, এই গতি আবার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। মানুষ প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছে—অতীতে এই সংগ্রাম ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে এখন সংগ্রাম করছে যে অপশক্তি মানুষের গতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে। মানুষ আগে চলার ছন্দ আবিষ্কার করেছে, এ চলার ছন্দ থামবে না। বর্তমানেও থেমে নেই, বরং ছন্দে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। প্রতিকূল অবস্থাকে সে জয় করবেই। এবং একদিন সুখী জীবন, শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবেই। তাই এই পর্বের লোকসঙ্গীতে সেই সংগ্রাম ও আগামী দিনের কল্পনা বেশি করে স্থান পাচ্ছে।

Cognition is the eternal, endless approximation of thought to the object. The reflexion of nature in man's thought must be understood not lifelessly not 'abstractly' not devoid of movement, not without contradiction, but in the eternal process of movement, the arising of contradiction and their solution. [২২]

আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা Higher technology-র যুগে folklore অচল। অনেক দেশেই Higher technology folklore-কে উৎকর্ষ করেছে। একটি দেশের খবর অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য দিয়েছেন, দেশটির নাম জাপান। ওখানে যে Dragon নৃত্য হয়, তার মধ্যে কোনো মানুষ থাকে না, থাকে যন্ত্র।

"যুগ পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে লোক সংস্কৃতি চলমান কালের চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে," একথা আগেই বলেছি, এবং সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যন্ত্রশিল্প সভ্যতা নাগরিকতার সর্বাধুনিকতার মধ্যেও লোক সংস্কৃতি বিবর্তিত এবং বিকশিত হয়"।[২৩]

উপরিউক্ত অভিমতের পক্ষে মার্কসের তত্ত্বানুযায়ী অনিবার্যভাবেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সংস্কৃতি মূলত জীবন বাস্তবতার উপলোধ, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা বন্টন রীতি ক্রমাগত ঐতিহাসিক বস্তুগত দ্বান্দ্বিক পথে ধাবমান এবং পরিবর্তনমুখী, যেহেতু জীবন গতিশীল তাই জীবন গতিশীলতার

অনিবার্য ভাবে সংস্কৃতিতেও রূপান্তর ঘটায়, লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতি folklore থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। লোক সংস্কৃতির সংগে উচ্চতর সংস্কৃতির পার্থক্য এইটুকুই শিষ্ট সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যক্তি মানসের ফসল, folklore সমাজ-মানসের ফসল। লোক-সংগীত অতি সহজে বিশেষ করে এই যুগে গণসংগীতের সাযুজ্য লাভ করতেই পারে বিষয়গত দিক থেকে। এই ক্ষেত্রে মার্কসের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

> Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. The tradition of all the dead generations weighs like a night mare on the brain of the living......... Thus the awakening of the dead in those revolutions served the purpose of glorifying the new struggle. [২৪]

লোক সংস্কৃতি শুধু অতীতের সাংস্কৃতিক বিষয় নয়, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের বিষয়ও। আজকার দিনের যে-চিন্তা চেতনা তা ভবিষ্যতে থাকবে না, নূতন চিন্তা-চেতনার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে লোক সংস্কৃতিতে স্থান করে নেবেই। তার কিছু কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যাকে গোর্কী বলেছেন Third reality. এই Third reality বিষয়ে বলেছেন, "without this reality we can not comprehend what the socialist realistic method is".

Folklore নিয়ে শুধু যে এংগেলস চিন্তা চর্চা গবেষণা করেছেন তাই নয়, পরন্তু বিপ্লবের প্রতিটি নায়ক চিন্তা করেছেন! লেনিন স্তালিন মাও সে-তুং তাঁদের মূল্যবান অভিমত রেখে গেছেন।

মাও-সে তুং "চীনের প্রগতিশীল গণসংস্কৃতির ব্যাখ্যা করে যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

.........ancient culture should neither be totally rejected nor blindly copied, but should be accepted discriminating so as to help the progress of China's new culture.[২৫] আবার অন্যত্র বলেছেন, "The future of Chinese poetry is folk songs first and the classic second. [২৬]

এংগেলস এত কথা Folklore বিশেষ করে লোকসংগীত বিষয়ে বলে গেছেন, যা সংকলন করলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যায়।

মার্কস তাঁর Critique of Political Economy গ্রন্থে লোককথা সম্পর্কে বহু জায়গায় বলেছেন।

পল লাফার্গ Folklore-এর যে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে তা বলেছেন তাঁর Sketches of the History of Primitive Culture গ্রন্থে। তিনি বিশেষ করে জোর দেন এই বলে যে যেসব জাতি গোষ্ঠীর লিখিত কোনো ইতিহাস নেই, Folklore সে বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। লোক-সংগীত ও কবিতাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ম্যাক্সিম গোর্কী সোভিয়েত সমাজের লেখক এবং শিল্পীদের দৃষ্টি Folklore-এর প্রতি আকর্ষণ করেন। Folklore থেকে যে সব বীরের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এইসব বীর ভাবী সমাজ গঠনের সংগ্রামে প্রেরণা যোগান। তিনি একথাও বলেন Folklore-কে দেখতে হবে "মেহনতী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামী সংকল্পের অভিব্যক্তি হিসাবে।" Folklore শ্রেণী দ্বন্দ্বের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অতীতে করেছে, এখনো করছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১) রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৩ পৃঃ ১৪০-৪১
২) Great Soviet Encyclopaedia Vol. 13 U.S.A. 1976 পৃঃ ২১৯
৩) A Dictionary of Philosophy Ed.—by M. Rosenthal and P. Yudin, Moscow পৃঃ ১০৭
৪) ভারতীয় দর্শন—ভূমিকা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫) Marx and Engels Selected Works Vol. 3 পৃঃ ১৭৮
৬) D. D. Kosambi—An Introduction to the Study of Indian History—Preface to the revised Edition
৭) A Biography—Progress Publishers 1974 পৃঃ ১৫
৮) ঐ পৃঃ ২২
৯) ঐ পৃঃ ২২
১০) ঐ পৃঃ ২২
১১) ঐ পৃঃ ২২
১২) ঐ পৃঃ ৪৭
১৩) ঐ পৃঃ ২১৮
১৪) ঐ পৃঃ ২১৯

১৫) Important Correspondence between Marx and Engels, reprinted from the 1934 Edition of Messrs Lawrence and Wishart Ltd., London, Published by National Book Agency Private Ltd. July 1945 পৃঃ ১৫৭
১৬) ঐ পৃঃ ১৫৮
১৭) A Biography—Progress Publishers Moscow পৃঃ ২২২
১৮) ঐ পৃঃ ২৩৬
১৯) ঐ পৃঃ ৩৭৬
২০) Studies in Oral Epic Tradition—Hugr 1975 —James Houli পৃঃ ৫৪, ১৬১
২১) ফোকলোরের পরিচিতি এবং লোক সাহিত্যের পঠন পাঠন—১৯৭৪ —মজহারুল ইসলাম পৃঃ ৪১৯
২২) Collected Works—Vol. 38, Moscow 1976 —V. I. Lenin পৃঃ ১৯৫
২৩) লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান—তুষার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৩৩৮
২৪) On Literature and Art—Marx and Engels Progress Publisher, Moscow পৃঃ ৭৯, ৮১
২৫) On Literature and Art—Mao Tse-tung Peking 1977 পৃঃ ১২১
২৬) Talks on the Fourth Conference, March, 1958 Mao Tse-tung unheared talks & letters 1965, 1961 Ed. Stuart Schvcu, Penguin Book 1974 পৃঃ ১২৩